শ্রীশ্রীবক্রেশ্বর-চরিত।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গপার্ষদ-প্রবর

শ্রীমৎ বক্রেশ্বর পণ্ডিতপ্রভুর জীবনী।

ভক্তজন-পদাশ্রিত

শ্রীঅমৃতলাল পাল দাস কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত।

কলিকাতা ;

২নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট্, "ভিক্টোরিয়া-প্রেসে"

শ্রীকুঞ্জবিহারী দাস দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩০৭ সাল।

উপক্রমণিকা

আমি অতি মূঢ় সেবকাধম। আমার ইষ্টদেব, জেলা মেদিনী-পুরের মধ্যে ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত চেতো দাসপুরের সন্নি-কট শ্রীপাট বলিহারপুর নিবাসী শ্রীপাদ যদুনাথ পাঠক গোস্বামী প্রভু নিমানন্দ-সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-পার্ষদবর শ্রীমৎ বক্রেশ্বর পণ্ডিতের অতি অন্তরঙ্গ ভক্ত ও সেবক শ্রীমদ্ গো-পালগুরু গোস্বামীর পরিবারভুক্ত, বৈষ্ণব গোস্বামী ছিলেন। আমার ঐ ইষ্টদেবের লোকলীলা সংবরণের পর হইতে কি জানি কেন, আদি গুরুদেব শ্রীমদ্বক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রভুপাদের মহিমা কীর্ত্তন করিবার জন্য আমার মনে এক বলবতী বাসনার উদয় হয়। কিন্তু এরূপ মহাপুরুষের অপার মহিমা কীর্ত্তন করা আমার মত ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে একবারেই অসাধ্য বলি-লেই হয়, তাহাতে আবার আমি বৈষ্ণব শাস্ত্রে এক প্রকার অনভিজ্ঞ এবং ভাষাজ্ঞানও তত নাই যে, পুস্তক প্রণয়ন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারি। কি করিয়া যে মনের ঐ সাধ মিটা-ইয়া প্রাণের উৎকণ্ঠা নিবারণ করিব, এই চিন্তাতেই অস্থির হইয়া উঠিলাম। বিশেষতঃ দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকায় তৎকালে অবসরও বড় ছিল না। অবশেষে মধ্যে মধ্যে ঐ আদি গুরুদেবের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি কয়েক খানি প্রাচীন শ্রীগ্রন্থ এবং অন্যান্য দুই চারি খানি

ভক্তিগ্রন্থ হইতে বক্রেশ্বর-চরিত সম্বন্ধে আমার বিবেচনায় যাহা কিছু সংগ্রহ-যোগ্য প্রাপ্ত হইলাম, সেই গুলি লিপি করিতে আরম্ভ করিলাম। শ্রীহট্ট মৈনা নিবাসী গৌরগতপ্রাণ গৌর-ভূষণ শ্রীমান্ অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয় বৈষ্ণব সমাজে শ্রীশ্রীমদ্গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ও তদীয় পারিষদবৃন্দের নিগূঢ় তত্ত্বজ্ঞ একজন পরম জ্ঞানবান্ বৈষ্ণব পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত আছেন। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার প্রণীত কয়েক খানি ভক্তচরিত গ্রন্থ এবং তাঁহার লেখনীপ্রসূত শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় কয়েকটী সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠে তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা পূর্ব্ব হইতেই উপজাত হইয়াছিল। একদিন মনে হইল, তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিব। এইজন্য পরিচয় না থাকা সত্ত্বেও বক্রেশ্বরচরিত সম্বন্ধে কিছু জানিবার জন্য তাঁহার নিকট এক-খানি পত্রী প্রেরণ করিলাম। তাঁহার শরীর সে সময় নিতান্ত কাতর ছিল, তথাচ তিনি আমার প্রতি কৃপা করিয়া পণ্ডিত প্রভু সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু লিখিয়া পাঠান এবং ঐ পত্রের মধ্যে লিখিলেন যে, "পার্ষদপ্রবর শ্রীমৎ বক্রেশ্বর-চরিত্র সম্বন্ধে অতি অল্পই জ্ঞাত হইতে পারা যায়, যদি সুবিধা হইয়া উঠে তবে ঐ পণ্ডিত প্রভুর বিষয়ে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় পরে লিখিতে ইচ্ছা রহিল।" তাহার কিছুদিন পরে দেখিলাম যে, নিমানন্দ সম্প্রদায়ী শ্রীমদ্বক্রেশ্বর পণ্ডিতের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত সম্বন্ধে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকার শ্রীগৌরাব্দ ৪১২ সনের আশ্বিন মাসের সংখ্যায়, বদনগঞ্জ নিবাসী বৈষ্ণবধর্ম্ম-নিরত পরম ধীমান্ বহুদর্শী ভক্ত পণ্ডিতবর ৺ হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয় একটী প্রবন্ধ লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ প্রবন্ধের

প্রথমেই লিখিত আছে যে, মহাত্মা অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয় আপন সুহৃদ্বর ঐ ভক্তিনিধি মহাশয়কে এই অধীনের জ্ঞাতব্য বিষয়টী জানাইয়া পত্র লিখিয়াছিলেন এবং ভক্তিনিধি মহাশয়ও নিজ বন্ধু তত্ত্বনিধি মহাশয়ের অনুরোধে এই দীনের প্রতি দয়া করিয়া ঐ প্রবন্ধটী লিখিয়াছেন। উক্ত প্রবন্ধ মধ্যে একস্থলে লিখিত হইয়াছে যে "নিমানন্দ সম্প্রদায়ী পণ্ডিত বক্রেশ্বরের বিষয় বঙ্গীয় প্রাচীন গোস্বামিকৃত ভক্তিগ্রন্থ সমূহে যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার ভিতর লিখিবার উপযুক্ত এমন কোন ইতিবৃত্ত নাই।" মৃত মহাত্মা হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয়ের বৈষ্ণবেতিহাস শাস্ত্রে যেরূপ বিশেষ পারদর্শিতা ও পাণ্ডিত্য ছিল, তাহা এক প্রকার সর্ব্বজন-বিদিত। তাঁহার ঐ কথাগুলির পর আমার বুঝিতে বাকি রহিল না যে, বক্রেশ্বর-জীবনী সম্বন্ধে উক্ত প্রবন্ধ মধ্যে যাহা কিছু বর্ণিত হইয়াছে, তদপেক্ষা আর অধিক লিখিবার কিছুই নাই এবং ঐ শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত ঐ প্রবন্ধের পর আমার নিরস্ত থাকিবারই কথা বটে এবং সেই অবধি কিছু কাল নিরস্তও ছিলাম। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা ও অপটুতা নিবন্ধন সরকারী কার্য্য হইতে একবারে অবসর গ্রহণ করিয়া বাটী আসিবার কিছু দিন পর আবার, ঐ প্রাণের যে উৎকণ্ঠার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহা পুনর্ব্বার আসিয়া উদিত হইল। তখন ভাবিলাম যে, আমার তো প্রকৃত ইতিবৃত্ত অর্থাৎ জীবনচরিত যাহাকে বলে, তাহা লিখিবার উদ্দেশ্য নহে, কেবল শ্রীপণ্ডিত প্রভুর মহিমা কীর্ত্তন দ্বারা মনের ব্যাকুলতা কতক পরিমাণে নিবারণ করাই উদ্দেশ্য। এই জন্য সেই জগদ্গুরু শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের শ্রীচরণ

ধ্যান করিয়া ও নিমানন্দ-সম্প্রদায়-প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমদ্বক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রভুর পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়া ও মদীয় দীক্ষা-গুরু স্বর্গগত শ্রীযদুনাথ পাঠক গোস্বামী প্রভুর শ্রীচরণ স্মরণ করিয়া "বক্রেশ্বর চরিত" নামে এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ইহাতে আমার নিজের রচিত বিষয় অতি অল্পই আছে এবং তাহাও অনভিজ্ঞ ব্যক্তির লিখিত বলিয়া সুতরাং ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ। অধিকাংশই ভক্তিগ্রন্থাদি হইতে ও ভক্তবৃন্দের লেখনীপ্রসূত পুস্তকাদি হইতে সঙ্কলিত ও উদ্ধৃত। এবং ভক্তি-নিধি মহাশয়ের প্রবন্ধের লিখিত বিষয় গুলিই এক প্রকার পুনরালোচিত। ইহা ছাড়া সাধুশ্রুতি দ্বারা এবং অনুসন্ধান দ্বারা যাহা অল্প কিছু অবগত হইয়াছি, তাহা অবলম্বনে কতক কতক বর্ণিত হইয়াছে।

পুস্তিকা খানি পাঠের যোগ্য হইয়াছে কি না, তদ্বিষয়ে সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, কেবল-সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি-দিগের নিকট ইহা অপাঠ্য হইলেও হইতে পারে; কারণ ইহা সাহিত্যশাস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তির লেখনীপ্রসূত। কিন্তু বৈষ্ণব মহো-দয়গণের নিকট একেবারেই অপাঠ্য হইবে না; কারণ পুস্তিকা খানির নামেই প্রকাশ পাইতেছে যে, ইহা একজন সাধুর জীবন-মাহাত্ম্য; সুতরাং লিখন-প্রণালী যতই কেন দোষপরিপূর্ণ হউক না, বিষয় জন্য আদরণীয় হইবেই হইবে। আর এক কথা যে, বৈষ্ণব মহোদয়গণের অবিদিত কোন নূতন কথা ইহাতে না থাকিলেও ইহা পরিত্যক্ত হইবে না, কারণ সাধু-মাহাত্ম্য পুনঃ পুনঃ আলোচিত হইলেও পুরাতন হয় না এবং এরূপ বিষয় পুনঃ পুনঃ আলোচনা সম্বন্ধে সাধু মহাত্ম-

গণই উপদেশ দিয়া থাকেন। অবশেষে সবিনয় নিবেদন এই যে, পাঠকগণ এ দীনের অজ্ঞতার বিচার না করিয়া মনের ভাবের প্রতি লক্ষ্য করত সকল ক্রটী মার্জ্জনা করিবেন।

শ্রীগৌরাঙ্গদাসানুগত

শিবপুর, দাসত্বাভিলাষী—

১৩০৭ সাল, ৮ই কার্ত্তিক। শ্রীঅমৃতলাল পাল দাস



শ্রীবক্রেশ্বর-চরিত



প্রথম অধ্যায়

জয় জয় শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ গৌ
জয় জয় শ্রীদেবা বিগ্রহ নিত্যানন্দ ॥
জয় জয় অদ্বৈত শ্রীবাস প্রিয়ধাম।
জয় গদাধর শ্রীজগদানন্দ প্রাণ ॥
জয় শ্রীপরমানন্দ পুরীর জীবন।
জয় দামোদর স্বরূপের প্রাণধন ॥
জয় বক্রেশ্বর পণ্ডিতের প্রিয়কারী।
জয় পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি মনোহারী ॥
জয় জয় দ্বারপাল গোবিন্দের নাথ।
জীব প্রতি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত ॥

শ্রীচৈতন্য-ভাগবত

শ্রীমদ্বক্রেশ্বর পণ্ডিত কলিযুগ-পাবনাবতার শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-দেবের অতি প্রিয় পারিষদ ছিলেন। তাঁহার মহিমা অপার ও অনন্ত। তাঁহার নাম স্মরণ মাত্রেই ত্রিভুবন পবিত্র হইয়া যায়। যথা শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে—

বক্রেশ্বর পণ্ডিত চৈতন্য-কৃপাপাত্র।
ব্রহ্মাণ্ড পবিত্র যাঁর স্মরণেই মাত্র॥

শ্রীপাদ বৈষ্ণবাচার্য্যগণ হিন্দুশাস্ত্রসমূহ মথিত করিয়া এই সার তত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন যে, শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পূর্ণব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান্। আর তিনি লীলার সহায় স্ব-পার্ষদগণ সহিত কলিযুগে নবদ্বীপ ধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

হিন্দু ধর্ম্মের শাক্ত, শৈব, সৌর ও গাণপত্য সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ অবতারবাদ মানেন না। কেবল বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণই অবতারবাদ স্বীকার করেন। এবং অবতার-তত্ত্ব বৈষ্ণব ধর্ম্মের মূলভিত্তি-স্বরূপ। তাঁহাদের মতে শ্রীভগবান্ কখন কখন এই মর্ত্ত্যভূমে মনুষ্যগণের মধ্যে মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া আসিয়া থাকেন এবং মনুষ্যের মত আচরণাদি করিয়া থাকেন। ইহাই শ্রীভগবানের অবতার-লীলা। ভগবান্ প্রপঞ্চাতীত এবং মায়াতীত; বৈকুণ্ঠাদি ধাম তাঁহার নিত্য বিলাস-স্থল। তবে তিনি এই মায়াময় জগতে যে মধ্যে মধ্যে দেহ ধারণ করিয়া লীলা প্রকাশ করেন, তাহা কেবল নিখিল প্রাণীর নিশ্রেয়স-বিধানের জন্য। তিনি স্বয়ং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় নিজ সখা অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন যে, "যখনই ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, তখনই সাধুদিগের পরিত্রাণ জন্য ও দুষ্কৃতকারিগণের বিনাশার্থ এবং ধর্ম্মসংস্থাপন নিমিত্ত আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।" যাঁহারা অবতারবাদ

মানেন না, তাঁহারা ঐ ভগবদ্বাক্য সম্বন্ধে নানা তর্ক উত্থাপিত করিতে পারেন। তাঁহারা বলিতে পারেন যে, ভগবান্ যখন সর্ব্বশক্তিমান্, যখন তিনি মনে করিলেই নিমেষ মধ্যেই কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও প্রলয় করিতে পারেন, তখন ধর্ম্ম-সংস্থাপন জন্য দেহ ধারণ করিয়া, দুষ্ট লোকদিগের বিনাশ করিবার নিমিত্ত অস্ত্রাদি ধারণ পূর্ব্বক সামান্য দেহীর মত কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইবার তাঁহার প্রয়োজন কি? এই প্রশ্ন সম্বন্ধে এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ভগবানের কার্য্য সম্বন্ধে প্রয়োজন অপ্রয়োজন বিষয়ে কোন তর্কই উঠিতে পারে না। তিনি কোন্ কার্য্য কি জন্য করেন, তাহা তিনিই জানেন; মায়া দ্বারা অভি-ভূত জীবের পক্ষে তাহা বুঝিয়া উঠা সহজ নহে এবং সে বিষয়ে মায়াভিভূত জীবের পক্ষে তর্ক দ্বারা কিছু মীমাংসা হইবারও সম্ভাবনা নাই। আমরা কেবল ইহাই বলিতে পারি যে, নরদেহ ধারণ করিয়া নরের মত কার্য্য দ্বারা ধর্ম্মসংস্থাপন করা তাঁহার নিজের ইচ্ছা; আমরা সে ইচ্ছাময়ের ইচ্ছার বিষয় কি বুঝিব? উপর্য্যুক্ত গীতোক্ত ভগবদ্বাক্যে কেহ কেহ এরূপ তর্কও করিয়া থাকেন যে, যদি ধর্ম্মসংস্থাপন করাই ভগবানের অবতারের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে তিনি তাহা সংসাধিত করিবার জন্য অন্য কোন সাধু পন্থা ও সৎ উপায় অবলম্বন করিতেন; দুষ্টগণের বিনাশরূপ গর্হিত প্রাণি-হিংসা কার্য্য কখনই করিতেন না। পূর্ব্ব প্রশ্ন সম্বন্ধে যে কথা বলা হইয়াছে, এ প্রশ্ন সম্বন্ধেও ঐ উত্তর হইতে পারে। আরও বলা যাইতে পারে যে, ভগবান্ সমস্ত বিধি-নিষেধের অতীত; তাঁহার কার্য্যে বিধি-নিষেধের নিয়ম খাটিতে পারে না। এতদ্ব্যতীত আমাদের বিবেচনায় যাহা কার্য্যাকার্য্য, তাঁহার কৃত কর্ম্মের প্রতি সে নিয়ম কোন ক্রমেই প্রযোজ্য হইতে পারে

না। সুতরাং অসুর-বিনাশকে গর্হিত কার্য্য বলিয়া ভগবানে দোষারোপ হইতেই পারে না এবং তদ্ধেতুক তাঁহার অবতার-লীলার প্রতি অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। বরং যত-দূর বুঝা যায়, তাহাতে অসুর-বিনাশ কার্য্য গর্হিত কার্য্য না হইয়া তদ্দারা ভগবানের জীবের প্রতি অপার করুণা-প্রকাশই প্রতি-পন্ন হইতেছে। কারণ আমরা মায়িক উপাদানে গঠিত বলিয়া আমাদের মায়াভিভূত মনে বা চক্ষে উহা বিনাশ বলিয়া বোধ হইতেছে, কিন্তু জ্ঞানের চক্ষে বিনাশ বা মৃত্যু বলিয়া কোন ঘট-নাই নাই। ভগবদগীতায়ও ভগবান্ সখা অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন যে, "যেমন মনুষ্য জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, তদ্রূপ দেহী এই জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্য অভি-নব দেহ ধারণ করিয়া থাকে।" যে জীব পূর্ব্ব-দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুণ্যকর্ম্ম-ফলে দিব্য দেহ পাইয়া সুখী থাকে, মৃত্যু তাহার পক্ষে শ্রেয়স্কর।

দুষ্কৃতকারিগণের এমন কোন পুণ্যকর্ম্ম-ফল হয়তো নাই, যদ্দারা তাহাদের এই মলিন-পরিচ্ছদরূপ পাপ-দেহের অন্ত হইলে অন্য কোন উৎকৃষ্ট দেহধারণে তাহারা সক্ষম হইতে পারে; কিন্তু ভগবানের হস্তে হত হওয়ায় তাহাদের আত্মার সদগতি হয়। অতএব ভগবান্ কৃপা-গুণেই তাহাদের মলিন-পরিচ্ছদ-রূপ পাপ-দেহ মোচন করিয়া তাহাদের আত্মার উন্নতিই করিয়া থাকেন।

যাহা হউক, এরূপ তর্কবাদ ভগবানের অন্যান্য অবতার সম্বন্ধে উঠিলেও অপার-প্রেমময় গৌর-অবতার সম্বন্ধে আর কিছুতেই উত্থাপিত হইতে পারে না। এই অবতারে তিনি দুষ্ট লোকদিগকে ঐরূপ অস্ত্র দ্বারা দমন করিয়া ধর্ম্মসংস্থাপন করেন নাই; কেবল

প্রেম-দান ও ভক্তি-শিক্ষা দিয়াই মলিন জীবগণকে উদ্ধার করিয়াছেন। বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতে ইহাই ভগবানের অব-তারের মূল প্রয়োজন। তাঁহারা বলেন যে, বহির্ম্মুখ জীবগণকে রস আস্বাদন করাইয়া আত্মপরায়ণ করিবার জন্যই শ্রীভগবান্ মর্ত্ত্যভূমে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। ভূভার-হরণাদি ও অসুর-বিনাশাদি কার্য্য যে তিনি সম্পন্ন করেন, তাহা কেবল আনু-ষঙ্গিক মাত্র। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

আনুষঙ্গ কর্ম্ম এই অসুর মারণ।
যে লাগি অবতার কহি সে মূল কারণ॥
প্রেমরস নির্যাস করিতে আস্বাদন।
রাগমার্গ ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ॥

শাস্ত্রে ভগবানের অবতারাবলি নানারূপ বলিয়া বর্ণিত হই-য়াছে। উহা পুরুষাবতার, লীলাবতার, গুণাবতার ভেদে ত্রিবিধ। আবার মন্বন্তরাবতার, যুগাবতার, কল্পাবতার প্রভৃতিও বহু-বিধ। ঐ সকল অবতারাবলির মধ্যে কোন কোন অবতারে ভগবান্ স্বয়ং-রূপ, ও কোন কোন অবতারে তিনি অংশ, কলা, আবেশ ও প্রকাশ স্বরূপ। যেখানে পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ স্বয়ং-রূপে প্রকট হন, তাহার মূল কারণই ঐ বহির্ম্মুখ লোককে আত্ম-পরায়ণ করা। আর অন্যান্য যে সকল আনুষঙ্গিক কার্য্য, তাহা অংশ, কলা প্রভৃতি অবতারের কার্য্য। তবে ভূভার-হরণাদি জন্য যখন ঐরূপ অংশ, কলা প্রভৃতি অবতার হন, তখন ভগবান্ পূর্ণরূপে অবতীর্ণ হইলে ঐ অংশাবতার, কলাবতার প্রভৃতি তাহাতে আসিয়া মিলিয়া থাকে। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

স্বয়ং ভগবানের কর্ম্ম নহে ভার হরণ।
স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণু করে জগৎ পালন॥
পূর্ণ ভগবান্ অবতরে যেই কালে।
আর সব অবতার আসি তাতে মিলে॥

শাস্ত্রে নির্ণীত হইয়াছে যে, ভগবানের বিবিধ অবতারাবলির মধ্যে দ্বাপর যুগে শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণরূপে স্বয়ং ভগবান্, "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।" আরও বর্ণিত আছে যথা—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণং॥

ব্রহ্মসংহিতা।

অস্যার্থঃ—সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর। তিনি সকলের আদি, কিন্তু তাঁহার আদি কেহ নাই; তিনি গোবিন্দ এবং সর্ব্বকারণ মায়ারও কারণ।

কবিরাজ গোস্বামীও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিয়াছেন—

স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়।
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়॥

ঐ যে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ গোবিন্দ অর্থাৎ সুরভীকুলের পরিপালক, সেই যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজবাসিগণ তাঁহাদের নিজজন ও নিজায়ত্ত বলিয়া অনুভব করিতেন। এবং তিনিই কলিযুগে নবদ্বীপ ধামে শ্রীচৈতন্য রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। যথা—চৈতন্যচরিতামৃতে—

সেই কৃষ্ণ-অবতারী ব্রজেন্দ্রকুমার।
আপনে চৈতন্যরূপে কৈল অবতার॥

কলিযুগ-পাবনাবতার শ্রীগৌরাঙ্গদেবই যে পূর্ণব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান্, সে সম্বন্ধে গৌরভক্ত বৈষ্ণবগণের অচল ও দৃঢ় বিশ্বাস; সুতরাং তাঁহারা আর সে বিষয়ের কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ বা যুক্তি চাহেন না। কিন্তু তাই বলিয়া যে, সে বিষয়ের কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ নাই, তাহা বলিবার যো নাই। ভাগবত পুরাণাদি ও তন্ত্রাদি বিবিধ শাস্ত্রে শ্রীভগবানের গৌরাবতারের ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এবং ঐ সকল প্রমাণ বিবিধ বৈষ্ণব শ্রীগ্রন্থাদিতে পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত ও আলোচিত হইয়াছে। সে সকলের আর এস্থলে পুনরালোচনা করা তত আবশ্যক নাই; কেবল মাত্র দুই চারিটী প্রমাণের উল্লেখ করা যাইতেছে—শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ স্কঃ, ৮ অঃ, ৯ শ্লোক যথা—

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥

শ্রীকৃষ্ণের নামকরণকালে গর্গাচার্য্য নন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, হে নন্দ! ত্বদীয় এই পুত্রটী প্রতিযুগেই দেহ ধারণ করিয়া থাকেন। ইঁহার শুক্ল, লোহিত ও পীত এই ত্রিবিধ বর্ণ হইয়াছিল, অধুনা (দ্বাপরে) ইনি কৃষ্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামীও এই শ্লোকটী অবলম্বনে, ইহার অর্থ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিয়াছেন। যথা—

শুক্ল রক্ত পীত বর্ণ এই তিন দ্যুতি।
সত্য ত্রেতা কলিকালে ধরেন শ্রীপতি॥

ইদানী দ্বাপরে ঞিঁহো হৈলা কৃষ্ণবর্ণ।
এই সব শাস্ত্রাগম পুরাণের মর্ম্ম ॥

তথাহি শ্রীমহাভারতে দানধর্ম্মে বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বিষ্ণুর সহস্র-নাম স্তোত্রের মধ্যে এই দুইটী শ্লোকার্দ্ধ পাওয়া যায়। যথা—

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ ॥

ঐ বৈশাম্পায়নোক্ত বাক্য শ্রীচৈতন্যলীলায় যেন অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপন্ন হইতেছে। অর্থাৎ প্রথম শ্লোকার্দ্ধটীতে সুবর্ণ-বর্ণ প্রভৃতি চারিটী নাম শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আদি লীলায় ও দ্বিতীয় শ্লোকার্দ্ধটীতে সন্ন্যাসকৃৎ হইতে শেষের চারিটী নাম শ্রীচৈতন্যের অন্ত্য লীলায় যে কিরূপ প্রযোজ্য, তাহা আর গৌরভক্তগণের বুঝিতে বাকি নাই এবং ভক্ত ছাড়া যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জীবন-কাহিনী কিছু কিছু অবগত আছেন, তাঁহারাও উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

ঐ মহাভারতীয় সহস্রনাম স্তোত্র সম্বন্ধে শ্রীমদ্বেদান্তাচার্য্য বলদেব বিদ্যাভূষণ স্বপ্রণীত "নামার্থ-সুধাভিধ" ভাষ্য মধ্যে কয়েকটী শ্রুতিবচন দ্বারাও দেখাইয়াছেন যে "সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গঃ" ইত্যাদি শ্লোকার্দ্ধ ও "সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো" ইত্যাদি শ্লোকার্দ্ধ শ্রীচৈতন্যদেবের অবতারত্ব অতি সুন্দররূপে ও স্পষ্টরূপে সপ্রমাণ করিতেছে। তাঁহার উদ্ধৃত একটী শ্রুতির অর্থ এই—

"বৈবস্বত মনুর সপ্তম মন্বন্তরে কলির প্রথম সন্ধ্যায় ভগবান্ নিজ আহ্লাদিনী-শক্তির সহিত একীভূত হইয়া স্বপার্ষদগণের সহিত অবতীর্ণ হওত স্বমন্ত্র—হরে কৃষ্ণ নামাদি প্রচারে জন-সকলকে কৃতার্থ করিবেন।"

আর একটী উদ্ধৃত শ্রুতিবচনের অর্থ। যথা—

"ইহার পর কলিযুগের চারিসহস্র বৎসর গতে পঞ্চসহস্র বৎসরের মধ্যে ভাগীরথী-তীরে ব্রাহ্মণ-কুলে মহাবিষ্ণুর প্রার্থনানুসারে আমি সর্ব্বলক্ষণযুক্ত সুদর্শন দীর্ঘ গৌরাঙ্গরূপে আবির্ভূত হইয়া বিদ্যা-বিনয়াদি ও বৈরাগ্য-সম্পন্ন এবং সকল বিষয়ের কামনা-শূন্য হইয়া সন্ন্যাসিমূর্ত্তি ধারণানন্তর ভক্তভাব অঙ্গীকারপূর্ব্বক রসাস্বাদন করিব। সেই সময়ে জনসমাজে মিশ্র বলিয়া বিদিত হইব"।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১স্কঃ, ৫অঃ, ২৯ শ্লোক—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥

অন্বয়ার্থঃ—করভাজন বলিয়াছিলেন, হে পৃথ্বীপতে! কৃষ্ণবর্ণ, ইন্দ্রনীলমণিবৎ জ্যোতিঃসম্পন্ন এবং অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্ষদ সমন্বিত হইয়া ভগবান্ যৎকালে অবতীর্ণ হয়েন, বিবেকী মানবগণ তৎকালে নামসংকীর্ত্তনরূপ যজ্ঞদ্বারা তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন।

আগম ও পুরাণাদিতে গৌরাবতারের প্রমাণের অভাব নাই। গৌরভক্ত গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত "যুগাবতার" নামক গ্রন্থে অনেকগুলি শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করা হইয়াছে। পাঠক মহোদয়গণের মধ্যে যাঁহাদের জানিতে ইচ্ছা হইবে, উক্ত গ্রন্থখানির ঐ অংশ তাঁহারা পাঠ করিয়া দেখিবেন।

ঐ সকল শাস্ত্রবচন দ্বারা জানা যাইতেছে যে, কলিযুগের ধর্ম্ম কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন, এবং ভগবান্ পীতবর্ণ ধারণ পূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়া ঐ যুগধর্ম্ম সংস্থাপন করিবেন। যুগধর্ম্ম সম্বন্ধে শাস্ত্রে স্পষ্ট বর্ণিত আছে যে, সত্যযুগের ধর্ম্ম—ধ্যানাদি; ত্রেতা-যুগের ধর্ম্ম—যাগযজ্ঞাদি; দ্বাপরের ধর্ম্ম—কৃষ্ণের অর্চ্চনাদি, এবং কলিযুগের ধর্ম্ম—হরিনাম সংকীর্ত্তন। যথা—

ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্ত্য কেশবং॥

অন্যত্র—

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥

কিন্তু যুগধর্ম্ম-সংস্থাপন শ্রীচৈতন্যের অবতারের উদ্দেশ্য হই-লেও উহা আনুষঙ্গিক মাত্র ছিল।

যেমন কৃষ্ণাবতারের একটী মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল—বহির্মুখ লোকদিগকে আত্মপরায়ণ করা, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যও পূর্ণ ভগবান্, তাঁহারও একটী মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল—নিজে প্রেমের সারাংশ আস্বাদন আর লোকমধ্যে রাগমার্গে ভক্তিপ্রকাশ। যেমন ব্রহ্মাদি দেবগণের প্রার্থনানুসারে শ্রীকৃষ্ণাবতারে অসুর-বিনাশাদি যে সকল কার্য্য হইয়াছিল, তাহা ভগবানের অব-তারের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না, কেবল প্রসঙ্গাধীন মাত্র বুঝিতে হইবে; সেইরূপ শ্রীচৈতন্যাবতারেও যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তন তাঁহার মুখ্য কর্ম্ম নহে—তবে যুগধর্ম্ম-কাল উপস্থিত হওয়ায় তাহাতে মিলিত হইয়াছিল মাত্র। ঐ যে মুখ্য উদ্দেশ্য, তাহাই সাধিত করিবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তকুল সহিত অবতার গ্রহণ করিয়া স্বয়ং প্রেমাস্বাদন করেন ও লোকমধ্যে নাম-সংকীর্ত্তন প্রকাশ করেন। কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিয়াছেন। যথা—

এইমত চৈতন্য কৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান।
যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন নহে তাঁর কাম॥
কোন কারণে যবে হৈল অবতারে মন।
যুগধর্ম্ম কালের হৈল সে কালে মিলন॥

এই হেতু অবতরি লৈঞা ভক্তগণ।
আপনে আস্বাদে প্রেম নামসংকীর্ত্তন॥

ভগবান্ নিজে এই অবতারে ভক্তভাব স্বীকার করিয়া নিজে রসাস্বাদন করিয়াছেন তাহার কারণ আর কিছুই নহে, কেবল নিজে আচরণ পূর্ব্বক লোকশিক্ষা দিবার জন্য। শাস্ত্রেও বর্ণিত আছে যে, নিজে ধর্ম্মাচরণ না করিলে অপরকে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া যায় না। শ্রীকবিরাজ গোস্বামীও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মহাপ্রভুর নিজের উক্তিস্বরূপে এই কথা দৃঢ় করিয়া বর্ণন করিয়াছেন। যথা—

আপনি করিব ভক্তভাব অঙ্গীকারে।
আপনি আচরি ধর্ম্ম শিখাব সভারে॥
আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়।
এই তো সিদ্ধান্ত গীতা ভাগবতে গায়॥

এক্ষণে দেখা গেল যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব যে সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, সে বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণের অভাব নাই; এবং তাঁহার অলৌকিক কার্য্যাদি দেখিলেও সে বিষয়ে আর কিছু মাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। এই জন্য শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিয়াছেন যে, এই সকল দেখিয়াও যে ব্যক্তির শ্রীগৌরাঙ্গের অবতারত্বে সন্দেহ হয়, সে ব্যক্তি মনুষ্যমধ্যে গণ্য হইবার যোগ্য নহে। যথা—

ভাগবত ভারত শাস্ত্র আগম পুরাণ।
চৈতন্য কৃষ্ণ অবতারের প্রকট প্রমাণ॥
প্রত্যক্ষ দেখহ নানা প্রকট প্রভাব।
অলৌকিক কর্ম্ম অলৌকিক অনুভাব॥

দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ।
উলূকে না দেখে যেন সূর্য্যের কিরণ॥

অন্যত্র, শ্রীকবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য দেব সম্বন্ধে বর্ণন করিয়াছেন। যথা—

কলিযুগে যুগধর্ম্ম নামের প্রচার।
তথি লাগি পীতবর্ণ চৈতন্যাবতার॥
তপ্ত হেম সম কান্তি প্রকাণ্ড শরীর।
নব মেঘ জিনি কণ্ঠ-নিস্বন গম্ভীর॥
দৈর্ঘ্যে বিস্তারে যেই আপনার হাতে।
চারি হস্ত হয় মহাপুরুষ বিখ্যাতে॥
ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল হয় তার নাম।
ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল-তনু চৈতন্য গুণধাম॥
আজানু লম্বিত ভুজ কমল লোচন।
তিল ফুল সম নাসা সুধাংশুবদন॥
শান্ত দান্ত নিষ্ঠা কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ।
ভক্তবৎসল সুশীল সর্ব্বভূতে সম॥
চন্দনের অঙ্গদ বালা চন্দন ভূষণ।
নৃত্যকালে পরি করে কৃষ্ণসংকীর্ত্তন॥
এই সব গুণ লৈয়া মুনি বৈশম্পায়ন।
সহস্র নামে কৈল তাঁর নাম গণন॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রেমামরতরোঃ প্রিয়ান্।
শাখারূপান্ ভক্তগণান্ কৃষ্ণপ্রেমফলপ্রদান্ ॥

অন্বয়ার্থঃ—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপ কল্পতরুর কৃষ্ণপ্রেম-ফলদাতা, অতি প্রিয়, শাখারূপ ভক্তদিগকে বন্দনা করি।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ভগবান্ যখন অবতার হন, তখন তিনি লীলাপরিকরগণ—নিজ সাঙ্গোপাঙ্গ ভক্তগণের সহিতই অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। গৌরাবতারেও ঐরূপ হইয়াছিলেন ; যথা—

সর্ব্ব অবতারের সকল ভক্ত লৈয়া।
বৃন্দাবনচন্দ্র গৌর বিহরে নদীয়া ॥

ভক্তিরত্নাকর।

ভগবানের ভক্তগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ; পারিষদ আর সাধক। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

সেই ভক্তগণ হয় দ্বিবিধ প্রকার।
পারিষদ্গণ এক, সাধকগণ আর ॥

যাঁহারা ভগবানের নিত্যসেবক বিশুদ্ধসত্ত্বতনু, তাঁহাদের নাম পারিষদ ; এবং যাঁহারা সাধনপ্রণালী দ্বারা ভগবানের ভজনাকারী, তাঁহাদের নাম সাধক। শ্রীচৈতন্য দেবের ঐ পারিষদগণ তাঁহার পাদপদ্মের ভ্রমর স্বরূপে অহর্নিশ মনের সাধ মিটাইয়া সেই চরণ-সুধা পান করিয়া কৃতার্থ হইতেন। এবং যে প্রেমরস জীবগণকে আস্বাদন করাইবার জন্য মহাপ্রভু নবদ্বীপে অবতার

হইয়াছিলেন, সেই প্রেমফল তিনি নিজে ও ঐ সকল ভক্তগণের দ্বারা অকাতরে বিতরণ করিয়াছিলেন। এইজন্য বৈষ্ণব ধর্ম্মের শ্রীগ্রন্থাদিতে গৌরাঙ্গদেবকে ভক্তিকল্পতরু এবং ঐ সাঙ্গোপাঙ্গ ভক্তগণকে শাখারূপে বর্ণিত করিয়াছেন। ঐ তরুর প্রধান দুইটী স্কন্ধ ছিলেন—প্রভু অদ্বৈত ও প্রভু নিত্যানন্দ; এবং ঐ স্কন্ধদ্বয়ের শিষ্য-প্রশিষ্য-ক্রমে বহুতর শাখা-প্রশাখায় জগৎ ব্যাপ্ত হইয়াছে। আরও প্রধান প্রধান পারিষদগণ-রূপ মূল-শাখাগণেরও ঐরূপ শাখা-প্রশাখায় পৃথিবী ছাইয়াছে। ঐ মূল-শাখাগণের মধ্যে শ্রীপণ্ডিত বক্রেশ্বর একটী বৃহৎ শাখা বলিয়া পরিগণিত। ঐ পণ্ডিত প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর অতি অন্তরঙ্গ ও প্রিয় ভক্ত ছিলেন। তাঁহার মহিমা সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত নিম্নলিখিত মহাপ্রভুর নিজ বচনটী উদ্ধৃত করা গেল; যথা—

প্রভু বলে তুমি মোর পক্ষ এক শাখা।
আকাশে উড়িতাম যদি পাঙ আর পাখা॥

শ্রীচৈতন্য দেবের অতি অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীকবি কর্ণপূর স্বরচিত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে একটী শ্লোক দ্বারা চৈতন্যকল্পতরুর ও শাখাগণের যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন, তাহার অর্থ এই; যথা—

"যতিমুকুটমণি মুনিবর মাধবাচার্য্য যাহার মূল, শ্রীযুক্ত অদ্বৈত প্রভু যাঁহার অঙ্কুর, ভুবন বিখ্যাত অবধূত শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যাঁহার স্কন্ধ, শ্রীবক্রেশ্বরাদি পণ্ডিতগণ যাঁহার মূলশাখা, যাঁহার সর্ব্বাঙ্গ মধুর রসে পরিপূর্ণ, সুবিস্তীর্ণ ভক্তিযোগ যাঁহার কুসুম; অকৈতব প্রেম যাঁহার ফল।"

ঐ শ্রীগ্রন্থে ঐ কল্পবৃক্ষের শাখাগণের মাহাত্ম্য আর একটী শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে; অর্থ যথা—"যাঁহার শাখা সকল ব্রহ্মানন্দ

ভেদ করিয়া বিরাজিত হইতেছে, যাহাতে রাধাকৃষ্ণ নামক লীলাময় খগ-মিথুন অভিন্ন ভাবে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, যাহার ছায়া গ্রহণ করিলে সংসারপথের পথশ্রান্তি এককালে দূর হইয়া যায়, ভক্তগণের অভীষ্টদাতা সেই চৈতন্যরূপ কল্প-বৃক্ষ এই অবনীমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছেন।”

অহো! জীবের বহুভাগ্য-ফলেই চৈতন্যাবতারের প্রকাশ। কি দয়ার ঠাকুরই অবনীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন! জীবগণ ভক্তি-রূপ অমৃত-ফল না চাহিলেও মহাপ্রভু ও তাঁহার পারিষদ ও ভক্তগণ যাচিয়া যাচিয়া সে ফল বিলাইতেন ও মলিন জীবকে তাহার রসাস্বাদন করাইয়া অজর ও অমর করিতেন। শ্রীচৈ-তন্যরূপ কল্পবৃক্ষের মূল, স্কন্ধ-শাখা, উপশাখা প্রভৃতি সর্ব্ব-স্থানেই ঐ প্রেমফল প্রচুর পরিমাণে ফলিয়াছে; যথা—চৈতন্য-চরিতামৃতে—

উড়ুম্বর বৃক্ষ যৈছে ফলে সর্ব্ব অঙ্গে।
এই মত ভক্তি-বৃক্ষ সর্ব্বত্র ফল লাগে॥

মহাপ্রভু নিজে তো যত পারিলেন, ততই ঐ প্রেমফল বিলাইলেন এবং শাখাগণকেও ঐরূপ অকাতরে বিলাইতে আজ্ঞা দিলেন। এবং ভক্তগণও প্রভু-আজ্ঞা-অনুসারে আনন্দে গদ্‌গদ হইয়া প্রেমফল দান করিয়া জীব-উদ্ধার-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীকবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন, যথা—

এক মালাকার আমি কাঁহা কাঁহা যাব।
একলা বা কত ফল পাড়িয়া বিলাব॥
একলা উঠাঞা দিতে হয় পরিশ্রম।
কেহ পায় কেহ না পায় রহে এই ভ্রম॥

অতএব আমি আজ্ঞা দিল সবাকারে।
যাঁহা তাঁহা প্রেমফল দেহ যারে তারে ॥

তখন—

এই আজ্ঞা কৈল যবে চৈতন্য মালাকার।
পরমানন্দ পাইল তবে বৃক্ষ-পরিবার ॥
যেই যাহা তাহা দান করে প্রেমফল।
প্রেম ফলাস্বাদে সুখে ব্যাপিল সকল ॥

শ্রীচৈতন্যরূপ কল্পবৃক্ষের শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতরূপ মূল-শাখার অমৃত ফল খাইয়া কত কত জনে যে উদ্ধার হইয়া গিয়াছে, তাহার সংখ্যা কে করিবে? যাহাকে তিনি কৃপা করিয়াছেন, সে অতি-বড় পাষণ্ডী হইলেও কৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্ত হইয়া অনায়াসে ভব-বন্ধন ছিন্ন করিতে সক্ষম হইয়াছে। এবং যে স্থানে তিনি কৃপা করিয়া কিছু দিনের জন্যও অবস্থিতি করিয়াছেন, সে স্থানের মহিমা আর কি কহিব, তাহা পরম পবিত্র তীর্থ হইয়া রহিয়াছে। শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতের মহিমা সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজের উক্তি এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে, যথা—

যে তে স্থানে যদি বক্রেশ্বর সঙ্গ হয়।
সেই স্থান সর্ব্বতীর্থ শ্রীবৈকুণ্ঠময় ॥

শ্রীগৌরাঙ্গরূপী শ্রীভগবানের পারিষদগণ মধ্যে শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রভু অদ্বিতীয় ও সর্ব্বপ্রধান ছিলেন। অবশ্য, ভগবানের অন্তরঙ্গ ভক্ত ও নিত্য সেবকগণের মধ্যে ছোট বড় কেহ নাই, কারণ তাঁহারা সকলেই সেই পাদপদ্মের মধুপসদৃশ। কবিরাজ গোস্বামীও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিয়াছেন যে—

চৈতন্য গোসাঞির যত পারিষদচয়।
গুরু লঘু ভাব কার না হয় নিশ্চয়॥

আর যদিও তাঁহাদের মধ্যে ছোট বড় কেহ থাকেন, তাহা বিচার করিবার ক্ষমতা আমাদের মত সাধারণ মনুষ্যের থাকিবার সম্ভাবনা নাই এবং তাহা বিচার করিতে যাওয়াও মহাদোষ। শ্রীকবিরাজ গোস্বামীই স্বয়ং উক্ত শ্রীগ্রন্থে বলিয়াছেন—

কেহ না করিতে পারে জ্যেষ্ঠ লঘু ক্রম॥

তবে কোন কোন বিশেষ বিষয় বিবেচনা করিয়া ভক্তবর গৌরগত-প্রাণ শ্রীযুক্ত শিশির কুমার ঘোষ মহাশয় তাঁহার রচিত অমূল্য গ্রন্থ "অমিয় নিমাই চরিতের" এক স্থানে তাঁহাকে মহাপ্রভুর ভক্তগণ মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ও অদ্বিতীয় বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

"গৌর অবতারে নৃত্যকারী দুই জন, সুন্দর পুরুষ চারি জন। সুন্দর পুরুষের মধ্যে সৌন্দর্য্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান শ্রীগৌরাঙ্গ, তাঁহার নীচে শ্রীগদাধর, তাঁহার নীচে শ্রীবক্রেশ্বর ও রঘুনন্দন। নৃত্যকারীর মধ্যে দুই জন প্রধান। প্রথম শ্রীগৌরাঙ্গ, দ্বিতীয় শ্রীবক্রেশ্বর। অতএব নৃত্য ও সৌন্দর্য্যে বক্রেশ্বর অদ্বিতীয়; প্রভুর ভক্তগণ মধ্যে সর্ব্বপ্রধান।"

শ্রীপণ্ডিত বক্রেশ্বর প্রভুর কলিযুগের জন্ম সম্বন্ধে মহিমার বিষয় সংক্ষেপতঃ কিছু বলা হইল, কিন্তু তিনি যে কত বড় বস্তু ছিলেন, তাহা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে তাঁহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মসম্বন্ধে যথাসাধ্য কিঞ্চিৎ বর্ণন করা প্রাসঙ্গিক হইতেছে। ভগবানের কোন এক অবতার-কালে কোন্ কোন্ পারিষদ বা ভক্ত, পূর্ব্ববর্ত্তী অবতারের কোন্ কোন্ পারিষদের প্রকাশ

রূপে জন্ম গ্রহণ করেন, তাহা স্থির করা সাধারণ জীবের সাধ্যায়ত্ত নহে। এক শ্রীভগবান্ই তাহা জানেন, আর তাঁহার বিশেষ কৃপাপাত্র কোন ভক্ত ভিন্ন আর কেহই এই বিষয় বলিয়া দিতে সক্ষম নহেন। আর ঐরূপ ভক্তও কি নিজ শক্তিতে তাহা জানিতে পারেন? ভগবান্ই তাঁহার প্রতি শক্তি সঞ্চার করিয়া তাঁহাকে উপলক্ষ মাত্র করতঃ ঐ গুরু রহস্য, সাধারণ সেবক ও ভক্তবৃন্দের প্রতি স্বয়ংই প্রকাশ করিয়া দিয়া থাকেন। গৌর অবতারেও যে সকল লীলা-পরিকরগণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবতারে কোন্ কোন্ পারিষদ বা সাধকের প্রকাশরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা মহাপ্রভুর ঐরূপ বিশেষ কৃপাপাত্র ভক্তগণ দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে, এবং তাঁহাদের দয়া দ্বারাই আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, শ্রীপণ্ডিত বক্রেশ্বর প্রভু সাক্ষাৎ অনিরুদ্ধের প্রকাশ ছিলেন। এবং কেবল তাহাও নহে; শ্রীকৃষ্ণের দ্বাপর-লীলায় শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীমতী রাধিকার প্রধান সখীগণের মধ্যে যিনি শশিরেখা নামে অভিহিতা ছিলেন, শ্রীবক্রেশ্বর প্রভু তাঁহারও প্রকাশরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এবং কোন কোন মতে তিনি ব্রজের তুঙ্গবিদ্যানাম্নী শ্রীরাধিকার অপরা প্রিয়-পরিচারিকার প্রকাশ ছিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

পূর্ব্বাধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, ভগবানের কোন্ কোন্ অবতারের কোন্ কোন্ পার্ষদ পরবর্ত্তী অবতারে কি কি মূর্ত্তিতে প্রকাশ হয়েন, তাহা কেবল ভগবানের কৃপাপাত্র কোন ভক্ত ভিন্ন সাধারণ লোকের জানিবার সম্ভাবনা নাই। কলিযুগ-পাবনাবতার শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের লীলার সময় তাঁহার ঐরূপ প্রিয় ও শক্তিমান্ কৃপাপাত্র ভক্ত একজন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—ইনি শ্রীকবি কর্ণপূর। তিনি গৌরগণোদ্দেশদীপিকা নামে এক খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহাতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর গণসমূহের পূর্ব্ব জন্ম নির্ণীত হইয়াছে। ঐ শ্রীগ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, শ্রীপণ্ডিত বক্রেশ্বর প্রভু সাক্ষাৎ অনিরুদ্ধের প্রকাশ ছিলেন। ঐ শ্রীগ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে, যথা—

ব্যূহস্তুর্য্যোঽনিরুদ্ধো যঃ স বক্রেশ্বরপণ্ডিতঃ।
কৃষ্ণাবেশজ-নৃত্যেন প্রভোঃ সুখ-মজীজনৎ ॥

যিনি তুর্য্যব্যূহ অনিরুদ্ধ, তিনিই বক্রেশ্বর পণ্ডিত। তিনি শ্রীকৃষ্ণাবেশ বশে সর্ব্বদা নৃত্য করিয়া মহাপ্রভুর সুখ সম্পাদন করিতেন। শ্রীভক্তমাল নামে আর একখানি বঙ্গীয় বৈষ্ণব শ্রীগ্রন্থেও লিখিত আছে, যথা—

ব্যূহ চতুর্থ অনিরুদ্ধ ভক্তি শক্তিমান্।
বক্রেশ্বর পণ্ডিত যেঁহো প্রেমের নিধান ॥

বৈষ্ণবাচারদর্পণ নামক পুস্তকে, যথা—

কৃষ্ণব্যূহ অনিরুদ্ধ আছিল পূর্ব্বকালে।
বক্রেশ্বর পণ্ডিত গোঁসাই জানিহ একালে॥

এক্ষণে অনিরুদ্ধ বস্তটী কি, তদ্বিষয়ে দু' একটী শাস্ত্রীয় কথার প্রসঙ্গাধীন অবতারণা করা যাইতেছে।

পরব্যোমপতি শ্রীমন্নারায়ণের বিবিধ অবতারের মধ্যে পূর্ব্বে যে পুরুষাবতারের কথা বলা হইয়াছে, অনিরুদ্ধ সেই পুরুষাবতারের অন্তর্গত। পরমেশ্বরের আদ্য অবতারই "পুরুষ" বলিয়া অভিহিত। এই পুরুষাবতার দ্বারা সৃষ্টিলীলা কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। সেই পুরুষাবতার চতুর্বিধ। শাস্ত্রে ইহার অভিধান চতুর্ব্ব্যূহ। এই চতুর্ব্ব্যূহের নাম বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ। যেমন কোন রণক্ষেত্রে যিনি সৈন্যাধ্যক্ষ, তিনি ব্যূহাভ্যন্তরে অবস্থিতি পূর্ব্বক অবাধে যুদ্ধ কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন, সেইমত ভগবান্ ঐ চারিব্যূহ দ্বারা অর্থাৎ নিজের চারি অংশ দ্বারা অর্থাৎ বাসুদেবরূপে, সঙ্কর্ষণরূপে, প্রদ্যুম্নরূপে, এবং অনিরুদ্ধরূপে সৃষ্টিলীলা করিয়া থাকেন। কবিরাজ গোস্বামীও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিয়াছেন, যথা—

আপনে করেন কৃষ্ণ লীলার সহায়।
সৃষ্টিলীলা কার্য্য করে ধরি চারি কায়॥

শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, যিনি আদিব্যূহ বাসুদেব, তিনি চিত্তে উপাস্য, যেহেতুক তিনি চিত্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। শ্রীসঙ্কর্ষণ ইহারই স্বাংশ অর্থাৎ বিলাস। ইনি মহত্তত্ত্বের সৃষ্টি-কর্ত্তা—সকল জীবের প্রাদুর্ভাবের আস্পদ। শ্রীপ্রদ্যুম্ন ইহারই

বিলাসমূর্ত্তি। ইনি ব্রহ্মাণ্ডের অর্থাৎ সমষ্টির অন্তর্যামী। বুদ্ধিমানেরা বুদ্ধিতত্ত্বে এই প্রদ্যুম্নের উপাসনা করিয়া থাকেন। ইনি বিধাতা-স্বরূপে সৃষ্টি কার্য্য সম্পাদন করেন। চতুর্থব্যূহ অনিরুদ্ধ ইঁহারই বিলাসমূর্ত্তি। মনীষিগণ মনস্তত্ত্বে এই অনিরুদ্ধের উপাসনা করেন—ইনি সর্ব্বভূতের অর্থাৎ ব্যষ্টির অন্তর্যামী। ইনি বিশ্ব-রক্ষণে তৎপর—ও ধর্ম্ম, মনু, দেবতা এবং নরপতিগণের অন্ত-র্যামী হইয়া জগৎ পালন করিয়া থাকেন। ইঁহার নামান্তর তুর্য্যব্যূহ।

চতুর্ব্ব্যূহের স্থান সম্বন্ধে কোন কোন শাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে, পরব্যোমের পূর্ব্বাদি-দিক্‌চতুষ্টয়ে বাসুদেবাদি চতুর্ব্ব্যূহ ক্রমান্বয়ে অবস্থান করেন। অন্যত্রে বর্ণিত আছে যে, জলাবরণস্থ বৈকুণ্ঠে বেদবতীপুরে বাসুদেব, সত্যলোকের উপরিভাগে বিষ্ণুলোকে সঙ্কর্ষণ, নিত্যাখ্য দ্বারকাপুরে প্রদ্যুম্ন, এবং শুদ্ধ জলনিধির উত্তর-তীরস্থিত ক্ষীরসমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী শ্বেতদ্বীপস্থ ঐরাবতীপুরে অনন্ত-শয্যায় অনিরুদ্ধ বাস করিতেছেন। তাঁহার বাসস্থান ঐ যে শ্বেতদ্বীপ, তাহারও বর্ণনা শাস্ত্রে এইরূপ আছে, যথা—এই স্থান অতি বৃহৎ, যাহার বিস্তার লক্ষ যোজন, সমস্ত সুদৃশ্য ও কাঞ্চন-ময় এবং যাহার নির্ম্মল শিলাতল ক্ষীরসমুদ্রের কুন্দকুসুম চন্দ্র ও কুমুদসদৃশ ধবল তরঙ্গরাশি দ্বারা পরিবেষ্টিত।

শ্রীগ্রন্থ শ্রীলঘুভাগবতামৃতে শ্রীঅনিরুদ্ধের রূপ সম্বন্ধেও এই-রূপ বর্ণিত আছে, যথা—"তাঁহার অঙ্গকান্তি নীল-নীরদের সদৃশ—।"

পরে যখন ভগবান্ দ্বাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণলীলায় স্বয়ংরূপে অব-তীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার ঐ কায়ব্যূহ সকলেরও অবতরণ হইয়াছিল। এই লীলায় শ্রীবৃন্দাবন, দ্বারকা ও মথুরায় বলরাম-

রূপী সঙ্কর্ষণ, এবং প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ ব্যূহ রূপেও লীলা করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত আছে, যথা—

মথুরা দ্বারকায় নিজ রূপ প্রকাশিয়া।
নানারূপে বিলসয়ে চতুর্ব্যূহ হঞা॥
বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ।
সর্ব্ব চতুর্ব্যূহ অংশী তুরীয় বিশুদ্ধ॥
এই তিন লোকে কৃষ্ণ কেবল লীলাময়।
নিজগণ লঞা খেলে অনন্ত সময়॥

শ্রীকৃষ্ণের সকল লীলাস্থান অপেক্ষা শ্রীবৃন্দাবনেরই মহিমা অধিক। সকল লোকের উপরিভাগে যে কৃষ্ণলোক, তাহা ঐ তিন লোকে পরিব্যাপ্ত হইলেও, বৃন্দাবনই শ্রেষ্ঠ। যথা—

—উপরিভাগে কৃষ্ণলোক খ্যাতি।
দ্বারকা মথুরা গোকুল ত্রিবিধত্বে স্থিতি॥
সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল ব্রজলোকধাম।
শ্রীগোলোক শ্বেতদ্বীপ বৃন্দাবন নাম॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

ঐ শ্রীগ্রন্থে ঐ লীলাস্থল সম্বন্ধে আরও বর্ণিত আছে, যথা—

চিন্তামণি ভূমি কল্পবৃক্ষময় বন।
সর্ব্বচক্ষে দেখে তারে প্রপঞ্চের মন॥
প্রেমনেত্রে দেখে তার স্বরূপ প্রকাশ।
গোপ গোপী সঙ্গে যাঁহা কৃষ্ণের বিলাস॥

শ্রীকবিরাজ গোস্বামী ব্রহ্মসংহিতার একটী শ্লোক অবলম্বনে এইরূপ বৃন্দাবন-মহিমা বর্ণন করিয়াছেন, ঐ মূল শ্লোকের অর্থ-টীও এস্থলে দেওয়া যাইতেছে। যথা—

"যত্রত্য গৃহসমূহ চিন্তামণি দ্বারা খচিত, যে স্থলে অসংখ্য কল্পতরু বিরাজমান রহিয়াছে, সেই স্থানে যিনি শতসহস্র লক্ষ্মী কর্তৃক সসম্ভ্রমে সেবিত হইয়া সুরভিদিগকে পালন করিতেছেন, আমি সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি।"

দ্বাপরযুগে ভগবানের বৃন্দাবন-লীলায় অনিরুদ্ধরূপে যিনি লীলার সহায়তা করিতেন, তাঁহার স্থান সম্বন্ধে শ্রীবৃন্দাবন-মাহাত্ম্যে বর্ণন আছে। শ্লোকার্থ যথা—"পূর্ব্বদিকে সুরদ্রুম-সমাকীর্ণ অরণ্যে হেমমণ্ডিত পীঠে শুভকর দিব্য সিংহাসন বিরাজিত আছে। তদুপরি দিব্যরূপিণী উষা সতীর সহিত জগৎপতি শ্রীমান্ অনিরুদ্ধ অধিষ্ঠিত আছেন।"

ঐ শ্রীবৃন্দাবন-মাহাত্ম্যে তাঁহার রূপ সম্বন্ধেও বর্ণন আছে; শ্লোকার্থ যথা—তিনি গাঢ় জলদবৎ শ্যামলবর্ণ, নীলবর্ণ স্নিগ্ধ কুন্তলবিশিষ্ট ও সুনাসিক। তদীয় উন্নত ভ্রূলতা-ভঙ্গীতে কপোল দেশ পরম রমণীয়তা ধারণ করিয়াছে। তাঁহার গ্রীবা সুগঠিত, এবং সুদৃশ্য বক্ষঃস্থল দ্বারা তাঁহাকে মনোহর হইতেও মনোহর দেখাইতেছে। তিনি কিরীটী, কুণ্ডলবান্ ও কণ্ঠভূষায় বিভূষিত। প্রিয়তম ভৃত্যগণ নিরন্তর তাঁহার আরাধনা করিতেছে। তিনি সঙ্গীতপ্রিয়, পূর্ণব্রহ্মানন্দে আনন্দিত ও শুদ্ধ-সত্ত্বস্বরূপ। তাঁহাকে দর্শনপূর্ব্বক ভক্তিসহকারে পূজা করিলে, অখিল কামনা পূর্ণ হইয়া থাকে।"

চতুর্থ অধ্যায়

শ্রীমৎ বক্রেশ্বর পণ্ডিতের পূর্ব্বজন্ম সম্বন্ধে পূর্ব্বে আভাষ দেওয়া হইয়াছে যে, ইনি কেবল অনিরুদ্ধ ব্যূহ ছিলেন না, শ্রীবৃন্দাবন-লীলায় শ্রীরাধিকার প্রধান সখীগণের মধ্যে যিনি শশিরেখা নামে অভিহিতা ছিলেন, ইনি তাঁহারও প্রকাশ ছিলেন। অতএব বক্রেশ্বর কি বস্তু, তাহা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য শশিরেখা সখী সম্বন্ধে দু'এক কথার অবতারণা আবশ্যক। এবং তাহা বলিবার পূর্ব্বে ভগবানের ব্রজলীলা বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলাও প্রয়োজন। এবং এ স্থলে এ কথাটীও বলিয়া রাখা উচিত যে, নবদ্বীপবিহারী শ্রীচৈতন্য দেব—শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা উভয় মিলিত। এই জন্য বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমদ্রূপ-গোস্বামিপাদ কৃত কড়চা গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে লিখিত হইয়াছে, যথা—

রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনী শক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপং ॥

অন্বার্থঃ—শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের বিকৃতিরূপিণীহ্লাদিনী শক্তিই রাধা নামে অভিহিতা; এই কারণে রাধাকৃষ্ণ একাত্মা হইয়াও অনাদিকাল হইতে বিলাসাভিলাষে অবনীতলে শরীর ভেদ স্বীকার করিয়াছিলেন। অধুনা সেই উভয়ে ঐকতা লাভ করত চৈতন্যাভিধানে প্রকাশিত হইয়াছেন; অতএব রাধাভাব ও

রাধাকান্তি সমন্বিত কৃষ্ণস্বরূপ (নরাকার পরব্রহ্ম-স্বরূপ) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে বন্দনা করি।"

এই শ্লোক দ্বারা বুঝা যাইতেছে, শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের হ্লাদিনী শক্তিই শ্রীরাধিকা। এক্ষণে হ্লাদিনী শক্তি কি ও তৎসম্বন্ধে শক্তিতত্ত্বের দু'একটী কথা বলা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। শাস্ত্রবাক্য এই যে, পূর্ণব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান্ "সচ্চিদানন্দ স্বরূপ" অর্থাৎ ভগবৎস্বরূপের আলোচনায় সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ এই তিনটী শক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোন পদার্থের বা কোন ব্যক্তির যে কোন কার্য্যক্ষমতা, তাহারই নাম তাহার সামর্থ্য বা শক্তি। যেমন সূর্য্যের প্রভা, অগ্নির দহন, ও অস্মদাদির দর্শন, শ্রবণ, গমনাদি শক্তি, সর্ব্বেশ্বর শ্রীভগবানেরও ঐরূপ স্বভাবসিদ্ধ যে অনন্ত কার্য্যক্ষমতা আছে, তাহাদেরই নাম ভগবৎশক্তি। ঐ শক্তিসমূহ সামর্থ্যরূপে শ্রীভগবানের স্বরূপে নিত্যই বিরাজ করিতেছেন। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদি শাস্ত্রে শ্রীভগবানের শক্তি অনন্ত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু শাস্ত্রকারগণ ঐ শক্তিসমূহ সামান্যতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; যথা—(১ম) স্বরূপশক্তি, যাহার নামান্তর অন্তরঙ্গা শক্তি;—(২য়) তটস্থা শক্তি অথবা জীবশক্তি;—(৩য়) মায়া শক্তি বা বহিরঙ্গা শক্তি। ঐ যে ভগবানের স্বরূপশক্তি, তাহাই সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ অংশে ত্রিরূপা। বৈষ্ণব শাস্ত্র মতে, ইহাদের অভিধান সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী। যথা—

সচ্চিৎ আনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
অতএব স্বরূপ শক্তি হয় তিন রূপ॥

আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানি ॥

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

আমরা এস্থলে ঐ হ্লাদিনী শক্তি কি, সেই সম্বন্ধেই দু'এক কথা বলিব। অর্থাৎ ভগবানের স্বরূপগত যে শক্তি দ্বারা তিনি স্বরূপের মধুরতা আস্বাদন করেন ও অন্যকে আস্বাদন করান, তাহারই নাম ভগবানের স্বরূপের হ্লাদিনী শক্তি। যখনই ভগবান্ নরদেহ ধারণ করিয়া অবনীতলে অবতীর্ণ হন, তখনই তিনি পুরুষরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন এবং স্ব স্বরূপের মধুর রস আস্বাদন করিতে ও অন্যকে আস্বাদন করাইতে ঐ হ্লাদিনী শক্তিও মূর্ত্তিমতী হইয়া প্রকৃতিরূপে বিরাজিতা হইয়া থাকেন। শ্রীবৃন্দাবনে ঐরূপেই শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ ও হ্লাদিনী শক্তি শ্রীরাধিকারূপে মূল প্রকৃতি। এই জন্যই রাধাকৃষ্ণ একাত্মা হইলেও বিলাসাভিলাষে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা দেহ ভেদ স্বীকার করিয়া রসাস্বাদন করিয়াছিলেন; যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি ॥
অন্যোন্যে বিলসয়ে রস আস্বাদন করি ॥

এই হ্লাদিনী শক্তি দ্বারা আনন্দ বিধান হয়, যেহেতুক এই শক্তির সম্যক্‌রূপে বিকাশ হইলে আনন্দচিন্ময় রস, যাহার নামান্তর প্রেম, সেই প্রেমের উদয় হইয়া থাকে। প্রেমের সার ভাব, আর সেই ভাবের ঘনীভূত অবস্থার নাম মহাভাব। সেই মহাভাবই চিন্তার সার চিন্তা বলিয়া চিন্তামণি নামে আখ্যাত এবং তাহাই শ্রীরাধিকার স্বরূপ বিগ্রহ। যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম ॥
আনন্দ চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান ॥
প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাব রূপা রাধা ঠাকুরাণী ॥
মহাভাব চিন্তামণি রাধার স্বরূপ।
ললিতাদি সখী তাঁর কায়ব্যূহ রূপ।

শ্রীভগবান্ এইরূপে বিলাস মানসে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা এই শরীরদ্বয় ধারণ করিয়াছিলেন। এবং রস আস্বাদনে এক প্রেয়সী অপেক্ষা বহু প্রেয়সী হইলে রসের আরও অধিক উল্লাস হইয়া থাকে, এই জন্যই ব্রজরস অধিক পরিমাণে পরিপুষ্ট করিবার নিমিত্ত ব্রজগোপীগণের আবির্ভাব। কিন্তু তাঁহারা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেহধারিণী হইলেও সকলেই ঐ মূল প্রকৃতি শ্রীরাধিকার অংশ বা কায়ব্যূহ স্বরূপ ছিলেন। যথা—

আকার স্বভাব ভেদে ব্রজদেবীগণ।
কায়ব্যূহ রূপ আর রসের কারণ ॥
বহু কান্তা বিনে নহে রসের উল্লাস।
লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ ॥

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

শ্রীকৃষ্ণাবতারে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পুরুষ এবং বিলাস জন্য তাঁহার হ্লাদিনী শক্তিরূপা কান্তারা স্ত্রীবেশে বিহার করিয়া ছিলেন, সুতরাং ঐ যে গোপীগণ, তাঁহারা সকলেই ভগবানের শক্তিরূপা; কারণ তাঁহারা হ্লাদিনী শক্তি যে শ্রীরাধা, তাঁহার অংশিনী মাত্র ছিলেন; আর ভগবৎশক্তি ভগবৎস্বরূপ হইতে অভেদ

বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকা লীলা জন্য দেহ ভেদ স্বীকার করিলেও অভেদাত্মক। যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

রাধা পূর্ণশক্তি কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরিমাণ॥

শ্রীকৃষ্ণকান্তাগণ ত্রিবিধ। প্রথম, বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীগণ; দ্বিতীয়, দ্বারকাধামে মহিষীগণ; তৃতীয়, শ্রীবৃন্দাবনে গোপিকা-মণ্ডলী। কিন্তু ইঁহাদের সকলের মধ্যে ব্রজরাণী শ্রীরাধিকাই মূল প্রকৃতি এবং লক্ষ্মীগণ ও মহিষীগণ অপেক্ষা ব্রজগোপীগণই সর্ব্বপ্রধান। কারণ তাঁহারা ঐ মূল প্রকৃতির কায়ব্যূহ বা তৎসদৃশ, এবং লক্ষ্মীগণ ঐ মূল প্রকৃতির অংশবিভূতি মাত্র আর মহিষীগণ কেবল মাত্র তাঁহার বিম্ব প্রতিবিম্ব স্বরূপ। যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

কৃষ্ণকান্তাগণে দেখি ত্রিবিধ প্রকার।
লক্ষ্মীগণ এক নাম মহিষীগণ আর॥
ব্রজাঙ্গনা রূপ আর কান্তাগণ সার।
শ্রীরাধিকা হইতে কান্তাগণের বিস্তার॥
অবতারী কৃষ্ণ যৈছে করে অবতার।
অংশিনী রাধা হইতে তিন গণের প্রচার॥

অন্যত্র—

লক্ষ্মীগণ হয় তাঁর অংশ বিভূতি।
বিম্ব প্রতিবিম্ব রূপ মহিষীর ততি॥

শ্রীকবিরাজ গোস্বামী যথার্থই ব্রজাঙ্গনাগণকে দেবী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারা সত্য সত্যই উপাস্য দেবী, এবং

জীবের বহু ভাগ্যফলে তাঁহাদের শ্রীপদে আশ্রয় পাইলে, সেই জীবের প্রতি ব্রজলীলা-রস উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হইয়া তাহার কামাদি বিকার বিনষ্ট করিয়া দেয় এবং ভগবানের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ জন্মাইয়া দিয়া তৎপদ-প্রাপ্তির অধিকারী করে। কারণ, গোপীপ্রেম প্রাকৃত প্রেম নহে, তাহা কামগন্ধশূন্য পরম নির্ম্মল প্রেম। গোপীদিগের গোপীবল্লভের প্রতি কিরূপ ঐকান্তিক অনুরাগ ছিল এবং কাম ও প্রেমের মধ্যে যে কি বিভিন্নতা, তাহা শ্রীল শ্রীকবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে অতি বিশদরূপে বর্ণিত করিয়াছেন।—

গোপীগণের প্রেম রূঢ় মহাভাব নাম।
বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম কভু নহে কাম॥
কাম প্রেম দোঁহার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ কাঞ্চন যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ॥
আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে কহি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥
কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্য হয় প্রেম মহাবল॥
বেদধর্ম্ম লোকধর্ম্ম দেহধর্ম্ম কর্ম্ম।
লজ্জা ধৈর্য্য দেহসুখ আত্মসুখ মর্ম্ম॥
দুস্ত্যজ আর্য্যপথ নিজ পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন ভর্ৎসন॥
সর্ব্ব ত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণের সুখ হেতু করে প্রেম সেবন॥

ইহারে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে যৈছে নাহি কোন দাগ॥
অতএব কাম প্রেম বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতমঃ, প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর॥
অতএব গোপীগণে নাহি কামগন্ধ।
কৃষ্ণসুখ লাগি মাত্র কৃষ্ণের সম্বন্ধ॥
আত্মসুখ দুঃখ গোপীর নাহিক বিচার।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে সঙ্গেত বিহার॥
কৃষ্ণ লাগি আর সর্ব্ব করি পরিত্যাগ।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ।

শ্রীকবিরাজ গোস্বামী এইরূপ বর্ণনা দ্বারা বুঝাইতেছেন যে, গোপিকাদিগের সংসারমায়া কিছুমাত্র ছিল না, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচরণে চিরদিনের জন্য এরূপে প্রাণ মন বিক্রীত করিয়াছিলেন যে, গৃহ, সংসার, স্বামী, পুত্র ও গুরুজন পরিত্যাগ করত, লোকলজ্জা ধর্ম্ম কর্ম্ম সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া, একবার মাত্র শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ করিলেই উন্মাদিনীর ন্যায় তাঁহার নিকট দৌড়িয়া যাইতেন। গোপীবল্লভ নিজে এক সময় প্রধান ভক্ত উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন, যথা শ্লোকার্থ—"হে উদ্ধব, গোপীগণ আমাতেই মন প্রাণ অর্পণ করিয়াছে, আমিই তাহাদের একমাত্র প্রাণ স্বরূপ; আমার জন্য তাহারা সমস্ত ব্যাপার ত্যাগ করিয়াছে, তাহারা আমাকে প্রিয় হইতেও প্রিয়তর বলিয়া জানে এবং আমি দূরে থাকিলেও তাহারা আমাকে স্মরণ পূর্ব্বক নিদারুণ বিচ্ছেদযাতনা সহ্য করিয়া থাকে। আমিই সেই বৃন্দাবনবিহারিণী গোপীদিগের আত্মা এবং তাহারাও আমারই জানিবে।"

তবে গোপীগণ যে নিজ দেহের শোভাবর্দ্ধন কার্য্য করিতেন, তাহাও কেবল শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি সম্পাদন মানসে বই আর কোন কারণে নহে। কারণ তাঁহারা জানিতেন যে, যখন তাঁহাদের দেহ কৃষ্ণভোগ্য, তখন তাহার প্রতি যত্ন করা আবশ্যক। শ্রীকবিরাজ গোস্বামী ইহাও বর্ণন করিয়াছেন, যথা—

তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজ দেহে প্রীত।
সেহোত কৃষ্ণের লাগি জানিহ নিশ্চিত॥
এই দেহ কৈল আমি কৃষ্ণে সমর্পণ।
তাঁর ধন এই তাঁর সম্ভোগ সাধন॥
এ দেহ দর্শন স্পর্শে কৃষ্ণ সন্তোষণ।
এই লাগি করে দেহের মার্জ্জন ভূষণ॥

যখন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ নবদ্বীপধামে গৌররূপে অবতীর্ণ হইলেন, তখন ঐ বৃন্দাবনবিহারিণী গোপীরাও লীলার সহায়তা জন্য শ্রীগৌরাঙ্গের পার্ষদরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবৃন্দাবনে ব্রজলীলা ও কলিযুগের গৌরলীলা উভয় লীলাই অতি গুহ্য। কিন্তু শ্রীবৃন্দাবনে গোপীগণের সহিত যে বিহাররূপ লীলা, তাহা কোন বহিরঙ্গ জীবের সম্মুখে আচরিত হয় নাই, একারণ উহাতে শক্তিরূপা রমণীগণ রমণীবেশেই বিহার করিয়াছিলেন— কিন্তু গৌরলীলা, কি অন্তরঙ্গ কি বহিরঙ্গ সর্ব্বপ্রকার জীবের সম্মুখে আচরিত হইয়াছিল, এই জন্য শ্রীবৃন্দাবনের যুবতী ললনারা গৌরলীলায় পুরুষবেশে পার্ষদ ও ভক্ত রূপে প্রকটিত হইয়াছেন। বেশপরিবর্ত্তন হইলে কি হইবে, তাঁহাদের প্রকৃতিগত বৈলক্ষণ্য কিছুই হয় নাই—সম্পূর্ণরূপে মিল দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন বৃন্দাবনলীলায় দেখা যায় যে, গোপীদের মন প্রাণ সকলই

শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের প্রতি সমর্পিত ছিল; গৌরাবতারেও দেখা যায় যে, ঐ সকল গোপীদের প্রকাশমূর্ত্তি স্বরূপ যে পার্ষদগণ, তাঁহাদেরও মন প্রাণাদি সর্ব্বস্ব একমাত্র শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীচরণারবিন্দে সংলগ্ন থাকিত। যেমন ব্রজগোপীগণ নিজ নিজ সুখ দুঃখের প্রতি কিছুই দৃষ্টিপাত করিতেন না, কেবল কিসে শ্রীব্রজরাজের সুখ সম্পাদন করিবেন সেই জন্যই নিরন্তর চেষ্টান্বিতা থাকিতেন, তেমনি নবদ্বীপলীলায়ও মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ ও ভক্তগণেরও, কিসে প্রভুর সুখ হইবে সেই দিকেই দৃষ্টি ছিল, তাঁহারা আপনাদের সুখ দুঃখের প্রতি অণুমাত্রও দৃষ্টিপাত করিতেন না।

এক্ষণে শ্রীবৃন্দাবনলীলার কোন্ ললনা, গৌরলীলায় কোন্ পুরুষবেশ ধারণ করিয়াছেন, তাহা বৈষ্ণবাচার্য্যগণ যেরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতেই জানা যায় যে, শ্রীমৎ বক্রেশ্বর পণ্ডিত শশিরেখার প্রকাশ। যথা গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় শ্রীকবিকর্ণপূর শ্রীবক্রেশ্বর সম্বন্ধে, তিনি যে অনিরুদ্ধের প্রকাশ ইহা বর্ণন করিয়া, লিখিতেছেন—

"স্বপ্রকাশবিভেদেন শশিরেখা তমাবিশৎ।"

অর্থাৎ প্রকাশভেদে ইনি শশিরেখারও প্রকাশ ছিলেন—

শ্রীভক্তমাল নামক গ্রন্থেও বর্ণিত হইয়াছে, যথা—

প্রকাশ ভেদেতে তেঁহো শশিরেখা সখী।
দুইরূপে এক দেহ গৌরসুখে সুখী॥

যেমন বক্রেশ্বর-মহিমা সম্বন্ধে অনিরুদ্ধ বস্তুটী কি তাহা প্রসঙ্গাধীন বর্ণন করা হইয়াছে, তেমনি এক্ষণে শশিরেখা সখী সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

শাস্ত্রাদিতে ভগবৎশক্তিরূপা ব্রজগোপীদিগের সংখ্যা ষোড়শ-সহস্র বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, তন্মধ্যে শ্রীমতী রাধাই প্রধানা; যথা—

গোবিন্দানন্দিনী রাধা গোবিন্দমোহিনী।
গোবিন্দসর্ব্বস্ব সর্ব্বকান্তা-শিরোমণি॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

ঐ সকল ব্রজগোপীগণের সহিত গোবিন্দ বিহার করিতেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলি শ্রীমতী রাধার অতিশয় প্রিয়কারিণী ও প্রধানা ছিলেন। কোন সময়ে ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতি মহাদেব, মা জগজ্জননী পার্ব্বতীর নিকট শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলাস্থল শ্রীবৃন্দাবনের মহিমা বর্ণন উপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণের মনোহর রূপলাবণ্য বর্ণন করিলে পর, পার্ব্বতী কর-জোড়ে নিবেদন করিলেন "নাথ! শ্রীব্রজধামে চিত্তমনোহারিণী ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের প্রধান সহায় কে কে ছিলেন, তাঁহাদের নাম ও বিবরণ শ্রবণ করিতে বড় বলবতী ইচ্ছা হইয়াছে, কৃপা করিয়া মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন"। পরমেশ্বর মহাদেব আনন্দিত হইয়া পার্ব্বতীকে বলিয়াছিলেন, যথা—শ্রীবৃন্দাবনমাহাত্ম্যে শিববচন, শ্লোকার্থ—"রাধিকাই মূল প্রকৃতি। প্রকৃতির অংশজাত ললিতাদি সখীগণ, রাধিকার সহিত যুগলরূপে সঙ্গত, স্বর্ণসিংহা-সনস্থিত, পূর্ব্বোক্তপ্রকার রূপ লাবণ্য বিশিষ্ট, দিব্য বিভূষণে, দিব্য বস্ত্রে ও দিব্য মাল্যে বিভূষিত, ত্রিভঙ্গ স্নিগ্ধমূর্ত্তি, গোপী-গণের নয়নতারা স্বরূপ, সতত সেব্য, সর্ব্বকারণ-কারণ গোবি-ন্দকে সেবা করিতেছেন। ঐ সকল ললিতাদি অষ্ট প্রকৃতি রসভাবে বিমুগ্ধা, কৃষ্ণের প্রিয়তমা ও প্রধানা। শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে ললিতাদেবী, বায়ুকোণে শ্যামলা, উত্তরে শ্রীমতী ধন্যা, ঈশান-

কোণে শ্রীহরিপ্রিয়া, পূর্ব্বদিকে বিশাখা, অগ্নিকোণে শৈব্যা, দক্ষিণে পদ্মা, ও নৈঋ্ঋত কোণে ভদ্রা, যথাক্রমে অবস্থিত। এই অষ্টপ্রকৃতি পবিত্রা, প্রধানা ও কৃষ্ণের ঐকান্ত প্রিয়তমা। রাধাই প্রধানা আদিমা প্রকৃতি। চন্দ্রাবতী, চন্দ্রাবলী, চিত্ররেখা, চন্দ্রা, মদনসুন্দরী, শ্রীমধুমতী, শশিরেখা ও হরিপ্রিয়া এই আট জনও রাধিকাসদৃশী প্রিয়তমা। এই যে ষোড়শ প্রকৃতির উল্লেখ হইল, ইঁহারা সর্ব্বপ্রধানা ও কৃষ্ণপ্রণয়িনী"।

এই শশিরেখা সম্বন্ধে বৃন্দাবন-মাহাত্ম্যে এইরূপ পরিচয় দেওয়া আছে, যথা—

সম্মোহজ্বর-রোমাঞ্চ-প্রেমধারা-সমন্বিতা।
শশিরেখা চ বিজ্ঞেয়া গোপালপ্রেয়সী সদা॥"

অর্থাৎ যিনি সম্মোহনরূপ জ্বর, রোমাঞ্চ ও প্রেমধারায় সমাকুলা, তিনিই শশিরেখা-নাম্নী গোপালপ্রিয়া জানিবে।

শ্রীকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা নামক গ্রন্থে শ্রীমতী রাধার যে আটজন প্রধান সহচরী বলিয়া বর্ণিত আছে, তাঁহাদের নাম ঐ গ্রন্থমতে—

(১) ললিতা (২) বিশাখা (৩) চিত্রা (৪) চম্পকলতিকা (৫) তুঙ্গবিদ্যা (৬) ইন্দুরেখা বা শশিরেখা (৭) রঙ্গদেবী (৮) সুদেবী—ইঁহাদের সকলের রূপ গুণ পরিচয়াদি সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ বর্ণন আছে, তদনুসারে শশিরেখার পরিচয় স্থলে লেখা আছে যে, ইনি হরিতালবর্ণা, দাড়িমীপুষ্প-বস্ত্রা, বিশাখা হইতে তিন দিবসের ছোট। পিতার নাম সাগর; মাতার নাম বেলা; পতির নাম দুর্ব্বল।

ধ্যানচন্দ্র পদ্ধতিতে ইঁহার সম্বন্ধে বর্ণনা আছে, যথা—

আগ্নেয়পাত্রপূর্ণেন্দু-কুঞ্জে স্বর্ণা[illegible]বর্ণকে।
ইন্দুরেখা বসত্যত্র স্বর্ণালঙ্কারমণ্ডিতা॥
প্রোষিতভর্ত্তৃকাভাবমাপন্না রতিযুগ্ঘরো।
অমৃতাশনসেবাঢ্যা যাসৌ নন্দাত্মজস্য বৈ॥
অসৌ তু বামপ্রখরা হরেশ্চামরসেবিনী॥

এই শ্লোকের স্বতন্ত্র বাঙ্গালা অর্থ না দিয়া, বৈষ্ণবাচার-দর্পণে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাই উদ্ধৃত করা যাইতেছে, যথা—

হরিতালোজ্জ্বলবর্ণা সখী ইন্দুরেখা।
তিন দিবসের বড় যাঁহার বিশাখা॥
ষষ্ঠেতে করিল ইন্দুরেখার গণন।
দাড়িম্ব কুসুম সম যাঁহার বসন॥
জননীর নাম বেলা জনক সাগর।
তুর্ব্বল পতির নাম কহিল তৎপর॥
দশা তের সমা সাত মাস সাত দিন।
মহা গুণান্বিতা পূর্ণ রসের প্রবীণ॥
বাম প্রখরতা ভাব সতত যাঁহার।
প্রোষিতভর্ত্তৃকা রস স্বর্ণ অলঙ্কার॥
পূর্ণচন্দ্র কুঞ্জে বাস অগ্নিকোণ দলে।
অমৃতাশন সেবা যেঁহ করে কুতূহলে॥

শ্রীভক্তমাল গ্রন্থে সখী ইন্দুরেখা বা শশিরেখা সম্বন্ধে, যেরূপ

বর্ণন আছে, তাহাতে তিনি ব্রজলীলার যে একজন প্রধান সহায় ছিলেন, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই ; যথা—

ইন্দুরেখা ষষ্ঠী হরিতালের বরণা।
দাড়িম্ব পুষ্প বসনা তিন দিনের ন্যূনা॥
বেলা নামে মাতা, পিতা সাগর সনামা।
সোয়ামী "দুর্ব্বল" স্বভাব প্রখরতা বামা॥
প্রিয়সখী অর্থে বশীকরণ মন্ত্রতন্ত্রে।
সামুদ্রিক আদি বিশারদা নানা যন্ত্রে॥
কৃষ্ণ আকর্ষণী কাম কত ছন্দ বন্ধ।
ছিটা ফোঁটা আদি জানে কতেক প্রবন্ধ॥
হারাদি গ্রন্থনে আর দশন রঞ্জনে।
অতি পটু আর সর্ব্ব রত্ন পরীক্ষণে॥
পট্ট-থোপ ডোর ঝাম্পা পুষ্পাদি নির্ম্মাণে।
সুবেশ করনে কেশে বেণীর রচনে॥
সৌভাগ্য তিলকচন্দ্র কপালে লিখনে।
দূত্য কর্ম্মে নিপুণা অভিসারাদি মিলনে॥
প্রিয়া প্রিয়সখী অর্থে গুণের অপণ।
সমর্পণ দেহ-গেহ-আদি প্রাণ ধন॥
রহস্য নিগূঢ় কথা কহনের যোগ্য।
সর্ব্বগুণময়ী যুগলের সুমনোজ্ঞ॥
পালিন্ধী প্রভৃতি সখী সঙ্গে কর্ম্মদক্ষ।
দোঁহার সুখের সুখী বৃন্দাবনের অধ্যক্ষ॥

এই তো গেল শশিরেখার বিবরণ। শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামী

প্রভুর পদ্ধতিমতে শ্রীপণ্ডিত বক্রেশ্বর, শ্রীরাধিকার অষ্টসহচরীর মধ্যে যিনি পঞ্চম পর্য্যায়ে তুঙ্গবিদ্যা নামে অভিহিতা হইয়াছেন, তাঁহারই প্রকাশ ছিলেন। শ্রীপাদ ধ্যানচন্দ্র গোস্বামী প্রভু তৎসম্বন্ধে বর্ণন করিয়াছেন, যথা—

কুঞ্জোঽস্তি পশ্চিমদলেঽরুণবর্ণঃ সুশোভনঃ।
তুঙ্গবিদ্যানন্দদো না-ম্নেতি বিখ্যাতিমাগতঃ॥
নিত্যং তিষ্ঠতি তত্রৈব তুঙ্গবিদ্যা সমুৎসুকা।
বিপ্রলব্ধাত্বমাপন্না শ্রীকৃষ্ণে রতিযুক্ সদা॥
নৃত্যগীতাদিসেবাঢ্যা গৃহমস্যাস্তু যাবটে।
দক্ষিণা প্রখরা খ্যাতাঽপ্যসৌ গৌররসে পুনঃ॥
বক্রেশ্বর ইতি খ্যাতি-মাপন্না হি কলৌ যুগে॥

শ্রীকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা মতে, তুঙ্গবিদ্যা সখী, বিশাখা হইতে পাঁচ দিনের জ্যেষ্ঠা, চন্দনমিশ্রিত-কুঙ্কুমবর্ণা, পাণ্ডুমণ্ডল-বস্ত্রা। পিতা পৌষ্কর, মাতা মেধা, পতি বালিশ।

বৈষ্ণবাচার-দর্পণে যথা—

চন্দন মিশান যেবা হৈয়াছে কুঙ্কুমে।
তুঙ্গবিদ্যা সখীরূপ কহিলা পঞ্চমে॥
পঞ্চম দিনের বড় বিশাখা হইতে।
অষ্টাদশ বিদ্যাতে বিখ্যাতা যে জগতে॥
দশা তের সমা সাত মাস পাঁচ দিন।
পাণ্ডুর মণ্ডল বস্ত্র অঙ্গেতে সুলীন॥
পৌষ্কর পিতার নাম, মেধা নামে মাতা।
বালিশ পতির নাম কহিলা সর্ব্বথা॥

দক্ষিণা প্রখরাভাব বিপ্রলব্ধা রতি।
তুঙ্গ-বিদ্যানন্দদ নামে কুঞ্জে স্থিতি॥
তৌর্য্যত্রিক সেবা-পরা পরমসাদরে॥

শ্রীভক্তমাল গ্রন্থে ঐ তুঙ্গবিদ্যা সখী সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে, যথা—

তুঙ্গবিদ্যা পঞ্চমী সুপাণ্ডিত্যে নিপুণা।
অষ্টাদশ বিদ্যা রস-শাস্ত্রে বিচক্ষণা॥
নাটক নাটিকা আর গন্ধর্ব্ব বিদ্যায়ে।
আচার্য্যের উপাসিতা পাণ্ডিত্য বিষয়ে॥
বিশেষতঃ গীতমার্গে বীণার বাদনে।
দৌত্যকর্ম্মে সুপণ্ডিতা সন্ধিকর্ম্ম স্থানে॥
সখীসঙ্গে গানে আর, মৃদঙ্গাদি বাদ্যে।
নানারস-রঙ্গভঙ্গী নৃত্যকলা পদ্যে॥
কৃষ্ণসুখে সুখী, সুখ দিতে সুপণ্ডিত।
বৃন্দাবনে অধিকারী সখীর সহিত॥

এই তো গেল তুঙ্গ-বিদ্যা সখীর বিবরণ। শ্রীপণ্ডিত বক্রেশ্বরের পূর্ব্বজন্ম সম্বন্ধে এই দুই অধ্যায়ে যাহা বলা হইল, তাহাতেই তাঁহার মহিমার বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে; ও তিনি যে কত বড় বস্তু তাহাও বুঝা যাইতেছে।

পঞ্চম অধ্যায়।

ইতিপূর্ব্বে ভগবানের অবতারলীলার বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিছু বলা হইয়াছে এবং গৌরাবতারেরও ঐ অন্তরঙ্গ মূল প্রয়োজন বিষয়েও যথাসাধ্য কিছু বর্ণিত হইয়াছে, ইহা ছাড়া বৈষ্ণব শ্রীগ্রন্থাদিতে শ্রীগৌরাঙ্গাবতারের একটী বেদ-গোপ্য কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শ্রীবৃন্দাবনবিহারিণী গোপী-দের প্রেম যে কি পদার্থ, তাহা তাঁহাদের ব্যবহারাদি দর্শনেই জানা যায়। সেই নির্ম্মল কামগন্ধশূন্য শ্রীরাধিকার যে প্রগাঢ় অনুরাগ, তাহা শ্রীকৃষ্ণও সকল সময় বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন না। ঐ রাধাপ্রেমে মুগ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের মনে তিনটী বাস-নার উদয় হইয়াছিল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণাবতারে ভগবানের ঐ তিনটী বাঞ্ছা পূর্ণ হওয়া তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই। সেই তিনটী বাঞ্ছা শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে ; যথা—

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাৎ
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥

শ্লোকার্থ,—শ্রীরাধার প্রণয়মাহাত্ম্য কীদৃশ ; শ্রীরাধা প্রেম দ্বারা যাহা আস্বাদ করিয়া থাকেন, মদীয় সেই অদ্ভুত মাধুর্য্যাতিশয়ই বা কি প্রকার ; আর মদীয় অনুভব নিবন্ধন রাধিকার যে সুখোদ্রেক হয়, সেই সুখই বা কিরূপ ; এই বিষয়ত্রয়ে লোভ নিবন্ধন রাধা-ভাব-সমন্বিত হইয়া শচীগর্ভরূপ সাগরে কৃষ্ণরূপ চন্দ্র প্রাদুর্ভূত হইলেন।

ঐ তিনটী বাঞ্ছা পরিপূর্ণ করিবার মানসে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার রূপলাবণ্য ধারণপূর্ব্বক, নিজের মধুরিমা নিজে সম্ভোগেচ্ছায় ভবিষ্যৎকালে অবতীর্ণ হইবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। যথা—

এই তিন তৃষ্ণা মোর নহিলা পূরণ।
বিজাতীয় ভাবে নহে তাহা আস্বাদন॥
রাধিকার ভাব কান্তি অঙ্গীকার বিনে।
সেই তিন সুখ কভু নহে আস্বাদনে॥
রাধাভাব অঙ্গীকারী ধরি তার বর্ণ।
তিন সুখ আস্বাদিতে হব অবতীর্ণ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত॥

রাধাপ্রেমের মাহাত্ম্যের কথা আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, সেই প্রেমের বশীভূত হইয়া রাধানাথ একেবারে জ্ঞানশূন্য হইয়া যাইতেন, এবং সেই প্রেম নেতা স্বরূপে তাঁহাকে যে কার্য্য করাইত, তিনি অনন্যগতি হইয়া নিশ্চেষ্টভাবে তাহাই করিতে বাধ্য হইতেন। তখন আর ভগবানের সর্ব্বেশ্বরত্ব থাকিত না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীকৃষ্ণের নিজের উক্তি; যথা—

পূর্ণানন্দময় আমি, চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব।
রাধিকার প্রেমে আমায় করায় উন্মত্ত॥
না জানি রাধার প্রেমে আছে কোন বল।
যে বলে আমারে করে সর্ব্বদা বিহ্বল॥
রাধিকার প্রেম গুরু, আমি শিষ্য নট।
সদা আমা নানা-নৃত্যে নাচায় উদ্ভট॥

তিনি সে প্রেমে এতই মুগ্ধ ছিলেন যে, গোপীদের তিরস্কার-বাক্যও তাঁহার প্রীতিকর হইত; যথা—

প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন।
বেদস্তুতি হৈতে সেই হরে মোর মন॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

তাঁহার নিজের মাধুর্য্যাতিশয় কিরূপ এবং তাহা আস্বাদন করিয়া শ্রীরাধিকার কিরূপ সুখানুভূতি হয়, তাহা শ্রীবৃন্দাবন-লীলায় ভগবানের বুঝিবার ক্ষমতা ছিল না, কারণ তিনি কেবল প্রেমের বিষয় ছিলেন মাত্র। প্রেমের আশ্রয় না লইলে আর ঐ অনুভূতি ও আনন্দ উপভোগ করা যাইতে পারে না। শ্রী-রাধিকাই সেই প্রেমের আশ্রয় ছিলেন। এই জন্যই তিনি তাহা উপভোগ করিতে সমর্থা ছিলেন। প্রেম বিষয়ে দুইটী পক্ষ; এক পক্ষ আশ্রয় আর এক পক্ষ বিষয়। যাঁহাতে প্রেম থাকে অর্থাৎ যিনি প্রেম আস্বাদন করেন, তিনিই প্রেমের আশ্রয়, আর যাঁর প্রতি প্রেম প্রযুক্ত হয় অর্থাৎ যাঁহাকে প্রেম করা যায়, তিনিই প্রেমের বিষয়। এই আশ্রয় ও বিষয় প্রেম-শাস্ত্রের বিভাবের অন্তর্গত অর্থাৎ রসতত্ত্ব মধ্যে বিভাব বলিয়া যে একটী বস্তু আছে, তাহাই দ্বিবিধ অর্থাৎ বিষয় ও আশ্রয়। ইহা আবার আলম্বন ও উদ্দীপন ভেদে দুই প্রকার। শ্রীভক্তমাল গ্রন্থে শ্রীরাধাকৃষ্ণের আশ্চর্য্য রস-চরিত্র এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে; যথা—

বিভাব যে দুই আলম্বন উদ্দীপন।
আশ্রয় বিষয় দুই বিধি আলম্বন॥

বিষয়ালম্বন কৃষ্ণ রসময় রূপ।
রসিক শেখর সর্ব্ব নায়কের ভূপ।

আশ্রয়ালম্বন কৃষ্ণবল্লভা নায়িকা।
কৃষ্ণের সমান গুণ জগতে অধিকা॥
দেব নর আদি ত্রিভুবনে যত নারী।
সভার মুকুট-মণি ব্রজের সুন্দরী॥
সফল যৌবন কৃষ্ণসনে স্মরকেলি।
ধন্যরূপা যৌবন ধন্য ধন্য ভালি ভালি॥

শ্রীললিতমাধব গ্রন্থে একটী শ্লোকে লিখিত আছে; যথা—

শ্লোকার্থ—"মণিভিত্তিতে স্বীয় প্রতিবিম্ব দর্শনপূর্ব্বক শ্রীহরি ঔৎসুক্য সহকারে বলিলেন, অহো! মদীয় মাধুরী কি নিরতিশয় আশ্চর্য্য! ইতি পূর্ব্বে ইহা দৃষ্ট হয় নাই। অধিক আর কি কহিব, ইহা দর্শনে আমিও লুব্ধমনা হইয়া কৌতুক সহকারে শ্রীমতী রাধিকার ন্যায় তাহা উপভোগ করিতে অভিলাষ করিতেছি।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও যথা—

* * * * *

স্বমাধুর্য্য দেখি কৃষ্ণ করেন বিচার॥
অদ্ভুত অনন্ত পূর্ণ মোর মধুরিমা।
ত্রিজগতে ইহার কেহ নাহি পায় সীমা॥
এই প্রেমদ্বারে নিত্য রাধিকা একলি।
আমার মাধুর্য্যামৃত আস্বাদে সকলি॥

মনে মনে এইরূপ বিচার করিয়া কহিয়াছিলেন ; যথা—

বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ উপায়।
রাধিকা-স্বরূপ হৈতে তবে মন ধায়॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

এই জন্যই ভবিষ্যতে রাধাভাব-সমন্বিত হইয়া অবতীর্ণ হইবার প্রতিজ্ঞা ভগবান্ করিয়াছিলেন ; যথা—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—ভগবানের প্রেমের আশ্রয় হইবার জন্য বাক্য—

সেই প্রেমের শ্রীরাধিকা পরম আশ্রয়।
সেই প্রেমের আমি হই কেবল বিষয়॥
বিষয় জাতীয় সুখ আমার আস্বাদ।
আমা হৈতে কোটিগুণ আশ্রয়ের আহ্লাদ॥
আশ্রয় জাতীয় সুখ পাইতে মন ধায়।
যত্নে আস্বাদিতে নারি কি করি উপায়॥
কভু যদি এই প্রেমের হইয়ে আশ্রয়।
তবে এই প্রেমানন্দের অনুভব হয়॥

ঐ প্রতিজ্ঞা পালন জন্য ভগবান্ কলিযুগে একই দেহে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণরূপে নবদ্বীপ ধামে অবতীর্ণ হইলেন, যথা—

সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোসাঞি।
রস আস্বাদিতে দুঁহে হৈলা এক ঠাঞি॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা মিলিত বলিয়া তাঁহার বর্ণও তদনুরূপ গৌর ও কৃষ্ণ মিলিত। বাহিরে তিনি রাধাভাবে

গৌরবর্ণ, কিন্তু অন্তরে কৃষ্ণবর্ণ। শ্রীরূপ গোস্বামি-পাদ স্তব-মালায় এইজন্য বলিয়াছেন,—

শ্লোকার্থ যথা—"কলিকালে সুধীগণ নামসংকীর্ত্তনময় যজ্ঞ দ্বারা যাঁহার আরাধনা করিয়া থাকেন, যিনি কৃষ্ণবর্ণ হইলেও শ্রীরাধিকার পরমা কান্তি দ্বারা গৌরবর্ণ ধারণ করিয়াছেন, এবং সুধীগণ যাঁহাকে চতুর্থাশ্রমী পরমহংসগণের আরাধ্য বলিয়া বর্ণন করেন, সেই চৈতন্যাকৃতি মহাপুরুষ মৎপ্রতি দয়া প্রকাশ করুন"। শ্রীজীবগোস্বামি-পাদও ভাগবতসন্দর্ভের মঙ্গলাচরণে আখ্যান করিয়াছেন, যথা—

অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবং।
কলৌ সঙ্কীর্ত্তনাদ্যৈঃ স্মঃ কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ॥

অর্থ—"যিনি অভ্যন্তরে কৃষ্ণ ও বহির্ভাগে গৌরবর্ণ দেহ প্রকাশ পূর্ব্বক কলিকালে সংকীর্ত্তনাদি দ্বারা অঙ্গাদির বৈভব প্রদর্শন করিয়াছেন, আমরা সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে আশ্রয় করি।"

অনাদিকাল হইতে ভগবান্ লীলাপ্রকাশের যে রীতি অবলম্বন করিয়া আসিতেছিলেন, কলিযুগে তাহার একটু ব্যতি-ক্রম করিলেন, অর্থাৎ লীলার জন্য ভগবৎস্বরূপ পুরুষরূপে ও হ্লাদিনীশক্তি প্রকৃতিরূপে দেহভেদ স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু গৌরাবতারে শক্তিমান্ ও শক্তি আর দুই দেহ অঙ্গীকার না করিয়া একই দেহে প্রকট হইলেন। তথাচ, মূলশক্তির অংশিনী শ্রীরাধিকার কায়ব্যূহরূপ গোপীগণও যে আবির্ভূত হইলেন, তাঁহারাও ভগবৎশক্তি, কারণ তাঁহারা মূলশক্তির অংশ ছিলেন। শ্রীপণ্ডিত বক্রেশ্বরও ভগবৎশক্তি। ভগবান্ও লীলা জন্য ছয় রূপে প্রকট হইয়া থাকেন। যথা—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

কৃষ্ণ, গুরু, শক্তি, ভক্ত, অবতার, প্রকাশ।
কৃষ্ণ এই ছয় রূপে করেন বিলাস॥

শ্রীকবিরাজ গোস্বামী ঐ ছয়টী তত্ত্ব সম্বন্ধে বিস্তাররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি লিপি করিয়াছেন যে, চৈতন্যাবতারে গদাধর পণ্ডিত, জগদানন্দ পণ্ডিত, বক্রেশ্বর পণ্ডিত, সরূপ দামোদর প্রভৃতি প্রিয় অন্তরঙ্গ ভক্তগণ শ্রীচৈতন্য-রূপী শ্রীকৃষ্ণের শক্তি ছিলেন। যথা—

শ্রীপণ্ডিত গদাধর আদি প্রভুর শক্তি।
তাঁ সবার পাদপদ্মে সহস্র প্রণতি॥

ভক্তিরত্নাকরেও লিখিত আছে, যথা—

শ্রীপণ্ডিত গদাধর আদি প্রভুর শক্তি।
কৃপা করি কারে বা না দিলা কৃষ্ণভক্তি॥

ঐ উভয় স্থলে "আদি" শব্দের মধ্যে যে শ্রীমৎ বক্রেশ্বর পণ্ডিত পরিগণিত, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ হইতে পারে না। বিশেষতঃ শ্রীচৈতন্য ভাগবতে একস্থলে স্পষ্টরূপেই উক্ত হইয়াছে, যথা—

বক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রভুর নিজশক্তি।
সেই কৃষ্ণ পায় যে তাঁহারে করে ভক্তি॥

গৌরাবতারে শ্রীমদ্বক্রেশ্বর পণ্ডিত অতি রূপবান্ ভক্ত ছিলেন। তাঁহার রূপ ঠিক শ্রীগৌরাঙ্গের রূপের সদৃশ, শুধু বাহিরে নহে, অন্তরেও। কারণ তিনিও বাহ্যে গৌর-কান্তি-ছিলেন বটে, কিন্তু অভ্যন্তরে কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন। ইহাই তাঁহার

রূপের বিশেষত্ব। শ্রীদৈবকীনন্দন কৃত বৈষ্ণববন্দনায় লিখিত আছে, যথা—

বক্রেশ্বর পণ্ডিত বন্দ দিব্য শরীর।
অভ্যন্তরে কৃষ্ণাবেশ গৌরাঙ্গ বাহির॥

এবং ইহা হইবারই কথা, কারণ তিনি অনিরুদ্ধের প্রকাশ হেতুক শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণের কায়ব্যূহস্বরূপ ছিলেন এবং শশিরেখা বা তুঙ্গবিদ্যা সখীর প্রকাশ নিবন্ধন হ্লাদিনীশক্তি শ্রীরাধিকার কায়ব্যূহস্বরূপ ছিলেন। এই জন্য তিনিও শ্রীকৃষ্ণের অংশ ও শ্রীরাধিকার অংশ মিলিত হওয়ায় উভয়ের বর্ণই ধারণ করিয়াছিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ইতিবৃত্ত।

শ্রীমৎ বক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের কিছু দিন পূর্ব্বে অর্থাৎ চতুর্দ্দশ শকাব্দের শেষভাগের কোন সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জন্মস্থান গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী এই মুক্তবেণী—পবিত্র তীর্থস্থান ত্রিবেণীর নিকট গুপ্তিপাড়া নামক গ্রামে ছিল, জানা যাইতেছে। এই গুপ্তিপাড়া গ্রাম তৎকালীন একটী প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণসমাজ বলিয়া পরিগণিত ছিল। বৈষ্ণবাচারদর্পণ নামক গ্রন্থে চতুঃষষ্টি মোহান্তের বর্ণন স্থলে একাদশ পর্য্যায়ে মোহান্ত বক্রেশ্বর পণ্ডিতের নাম লিখিত হইয়াছে; যথা—

অনিরুদ্ধব্যূহ হয় পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
কৃষ্ণের আবেশে নৃত্য করেন বিস্তর॥
প্রকাশ বিভেদে যাঁর নাম শশিরেখা।
গুপ্তিপাড়ায় বাস শ্রীচৈতন্যের প্রিয়সখা॥

এই পণ্ডিত প্রভুর পিতা মাতার নাম অথবা তাঁহার শৈশব-চরিত্র সম্বন্ধে প্রাচীন বৈষ্ণব শ্রীগ্রন্থাদিতে কিছু জানিতে পারা যায় না। কেবল এইমাত্র বলিতে পারা যায় যে, তিনি কোন প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অতি অল্প বয়সেই বহুশাস্ত্র-বিশারদ হইয়া উঠিয়াছিলেন। বিশেষতঃ তিনি বেদান্তশাস্ত্রে একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। এই বেদান্তশাস্ত্রে অতিশয় বিজ্ঞতার জন্যই তিনি সাধারণতঃ পণ্ডিত উপাধিতে ভূষিত হয়েন। তাঁহার কুলগত উপাধি কি ছিল, সে বিষয়েও কিছুই জানিতে পারা যায় না। শ্রীযুক্ত হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় যে প্রবন্ধটী লিখিয়াছিলেন তাহাতে তিনি বলেন যে, "বেদান্ত-শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া তাঁহার কুলগত উপাধি ধরিয়া কেহ ডাকিতেন না, পণ্ডিত বলিয়া সকলে গণ্যমান্য ও সম্মান করিতেন, সেই কারণেই তাঁহার বংশ-উপাধি ঢাকিয়া গিয়াছিল।"

শ্রীমৎ বক্রেশ্বর প্রভু কোন দার-পরিগ্রহ করেন নাই এবং যৌবনেই সংসার-বিরক্ত উদাসীন হইয়া কেবল জ্ঞানচর্চ্চাদি দ্বারাই জীবন অতিবাহিত করিতেন। কিছু দিন পরে, বোধ হয় শুষ্ক ও নীরস জ্ঞানমার্গ তাঁহার প্রতি তত সুখকর বোধ না হওয়ায়, তিনি শান্তিপুরে গমনপূর্ব্বক যোগেশ্বর শ্রীমৎ

অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর নিকট যোগ শিক্ষায় নিযুক্ত হয়েন এবং তাঁহারই সহিত মিলিত হইয়া যোগসাধন করেন। এবং যোগসিদ্ধি লাভ করিয়া চরম ফল শ্রীচৈতন্যরূপী ভগবানের শ্রীচরণ লাভে-কৃতার্থ হইয়াছিলেন। শ্রীমৎ বক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রভু যোগেশ্বর শিবাবতার শ্রীমদ্ অদ্বৈত প্রভুর সহিত যে যোগ সাধন করিয়াছিলেন, সে যোগ অষ্টাঙ্গাদি যোগ নহে—সে যোগ ভক্তিযোগ। যে যোগের সিদ্ধিফলে অণিমা, লঘিমা প্রভৃতি অষ্টসিদ্ধি-রূপ ভগবৎ-ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারা যায়, এ যোগ সে যোগ নহে—এ যোগ সেই যোগ, যে যোগের ফলে শ্রীল শ্রীঅদ্বৈত প্রভু কলিযুগের মলিন জীবগণের উদ্ধার জন্য কলিযুগ-পাবনাবতার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেবকে আকর্ষণ করিয়া, শ্রীবৈকুণ্ঠধাম পরিত্যাগ করাইয়া মর্ত্তভূমে নরদেহধারী করাইয়াছিলেন। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ঐ ভক্তিযোগ-সাধনে যম, নিয়ম, আসন প্রভৃতির প্রয়োজন তত ছিল না, তাঁহার সেই যোগসাধন সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে লিখিত আছে, যথা—

তুলসীর মঞ্জরী সহিত গঙ্গাজলে।
নিরবধি সেবে কৃষ্ণ মহা কুতূহলে॥

হুঙ্কার করয়ে কৃষ্ণ-আবেশের তেজে।
সে ধ্বনি ব্রহ্মাণ্ড ভেদি বৈকুণ্ঠেতে বাজে॥

যে প্রেমের হুঙ্কার শুনিয়া কৃষ্ণনাথ।
ভক্তিবশে আপনে সে হইলা সাক্ষাৎ॥

অতএব অদ্বৈত বৈষ্ণব অগ্রগণ্য।
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে যাঁর ভক্তিযোগ ধন্য।

যখন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীধাম নবদ্বীপে প্রকট হইলেন, তখন শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সহিত সম্মিলিত হইয়া তাঁহার পার্ষদগণ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন। ঠিক কোন্ সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত তাঁহার মিলন হয়, তাহা নিশ্চিতরূপে জানা যায় না—তবে ইহা এক প্রকার অনুমান করিতে পারা যায় যে, যখন মহাপ্রভু নিমাই পণ্ডিতরূপে নবদ্বীপে বিরাজ করিতেছিলেন, সেই সময় সম্ভবতঃ শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর সহিতই আসিয়া বক্রেশ্বর মহাপ্রভুর চরণাশ্রয় করেন। এবং তিনি প্রথমে যে নিমাই-রূপ দর্শন করিলেন, অমনি সেই রূপসাগরে একেবারে ডুবিয়া গেলেন এবং সেই গভীর অতলস্পর্শ রূপসাগর হইতে আর উঠিতে পারিলেন না। চিরজীবনেই মহাপ্রভুর সকল রূপ অপেক্ষা পরম রমণীয় নিমাই-পণ্ডিত-রূপই তাঁহাকে ভাল লাগিত ও লীলাময়ের সকল নাম অপেক্ষা মধুর নিমাই-নামই তিনি ভালবাসিতেন। আমরা লীলাময়ের নবদ্বীপ-লীলায় তাঁহার দুইটী নিমাই-পণ্ডিত রূপ দেখিতে পাই। এক সেই—গয়াধাম যাইবার পূর্ব্বে অসাধারণ পাণ্ডিত্যসম্পন্ন কেশব কাশ্মীরি নামক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের দর্পচূর্ণকারী, উদ্ধতস্বভাব, তাৎকালিক নদীয়াবাসী ভক্ত বৈষ্ণবদিগকে উপহাসকারী—নিমাই-পণ্ডিত; আর এক—ঈশ্বর পুরীকে ধন্য করিয়া তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করত গয়াধাম হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর অতিশয় বিনীতস্বভাব, দীনতার পরা কাষ্ঠা-প্রদর্শক, পরম বৈষ্ণব—নিমাই পণ্ডিত। লীলাময়ের প্রথম নিমাইপণ্ডিত-রূপে বিরাজসময়ে নদীয়াবাসী কৃষ্ণভক্তগণ তাঁহার পাণ্ডিত্যে বিমোহিত হইয়া এবং তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা দর্শন করিয়া, তিনি যে সামান্য মানুষ নহেন ইহা কতক পরিমাণে বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং

তাঁহার মত অদ্ভুত ক্ষমতাশালী ব্যক্তি বৈষ্ণবগোষ্ঠী মধ্যে প্রবেশ করিলে বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইতে পারে ইহা ভাবিয়া মনে মনে সর্ব্বদাই তাহা বাঞ্ছা করিতেন। কিন্তু মহাপ্রভু সে সময় তাঁহাদের বিদ্রূপ করিতেন এবং কেবল শাস্ত্রীয় তর্ক করিয়া তাঁহাদের পরাস্ত করিতেন; এইজন্য শ্রীবাস, মুকুন্দ প্রভৃতি প্রধান প্রধান বৈষ্ণবগণ বড় একটা তাঁহার কাছে ঘেঁসিতেন না। একদিন নিমাই পথে যাইতে যাইতে দেখিলেন, মুকুন্দ গঙ্গাস্নানে যাইতেছেন, কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া অন্য পথে চলিয়া গেলেন। তদ্দর্শনে নিমাই আপন সঙ্গীদের প্রতি বলিলেন, "বুঝিতেছ, মুকুন্দ প্রভৃতি মনে করে যে, 'আমি কৃষ্ণবহির্ম্মুখ, অতএব আমার সহিত বৃথা আলাপ করিবে না; কিন্তু উহারা জানে না যে, আমি যখন বৈষ্ণব হইব, তখন উহারা কি, অজ ভব পর্য্যন্ত আমার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইবেন।" শ্রীপাদ বৃন্দাবনদাস গোস্বামী শ্রীচৈতন্যভাগবতে, প্রভুর ঐ সময়ে মুকুন্দের পলায়ন সম্বন্ধে সঙ্গীদের সহিত যে কথোপকথন, তাহা বর্ণন করিয়াছেন; যথা—

প্রভু বলে আরে বেটা কতদিন থাক।
পলাইলে কোথা মোর এড়াইবে পাক॥
হাসি বলে প্রভু আগে পড় কত দিন।
তবে সে দেখিবে মোর বৈষ্ণবের চিন্॥
এমন বৈষ্ণব মুঞি হইমু সংসারে।
অজ ভব আসিবেক আমার দুয়ারে॥
শুন ভাই সব এই আমার বচন।
বৈষ্ণব হইব মুঞি সর্ব্ব-বিলক্ষণ॥

আমারে দেখিয়া এবে যে সব পলায়।
তাহারাও যেন মোর গুণ কীর্ত্তি গায়॥

পরে গয়াধাম হইতে ফিরিয়া আসিবার পর প্রভু যে নিমাই পণ্ডিতরূপে বিহার করিতে লাগিলেন, তাহাতে আর ভক্তবৃন্দের বুঝিতে বাকি রহিল না যে, নিমাই পূর্ণব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান্। ঐ সময়েই বহু দূর-দেশবাসী ভক্তগণও আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার সহিত আসিয়া মিলিত হইলেন। যথা—

নানা দেশে যতেক আছিল ভক্তগণ।
সবেই মিলিলা আসি প্রভুর চরণ॥

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল।

আর কি গৌরভক্তগণ গৌরশূন্য দেশসমূহে থাকিতে পারেন? তাঁহারা নাকি শ্রীচৈতন্য-পাদপদ্মের ভ্রমর, সুতরাং মধুলোলুপ ঐ ভ্রমরগণকে ঐ পদ্ম-সমীপে আসিতেই হইল এবং তদবধি তাঁহারা ঐ মধুপানে মত্ত ও আত্মহারা হইয়া ঐ পদ্ম-সমীপে রহিয়া গেলেন। যথা—

ভকত চকোর সব আসিয়া মিলিলা।
প্রেমামৃত পান করি সবেই ভুলিলা॥

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল।

সম্ভবতঃ ঐ সময়েই শ্রীপাদ বক্রেশ্বর পণ্ডিতও মহাপ্রভুর সহিত সম্মিলিত হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গ দেব সংকীর্ত্তনরূপ যে নূতন ভজনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করেন এবং ঐ সংকীর্ত্তন-তরঙ্গে যখন নবদ্বীপ প্লাবিত করিলেন, সেই সংকীর্ত্তন-তরঙ্গে যে যে ভক্তের নাম শ্রীগ্রন্থসমূহে প্রাপ্ত হওয়া যায়,— তাহাতে আমরা শ্রীবক্রেশ্বরেরও নাম দেখিতে পাই। ঐ সময়ে

প্রতি রজনীতে প্রধান ভক্ত নদীয়াবাসী শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে শ্রীগৌরাঙ্গদেব সঙ্কীর্ত্তনানন্দে আপনি মাতিতেন ও ভক্তগণকে মাতাইতেন এবং মধ্যে মধ্যে এক একদিন অপর অন্তরঙ্গ ও প্রিয়ভক্ত নদীয়ার অধিবাসী শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যের আলয়েও সঙ্কীর্ত্তন করিতেন। ঐ সঙ্কীর্ত্তনকারী প্রধান প্রধান ভক্তগণের যে নামাবলী শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিত আছে, তাহাতে বক্রেশ্বরের নামও আছে ; যথা—

শ্রীবাস-মন্দিরে প্রতি নিশায় কীর্ত্তন।
কোন দিন হয় চন্দ্রশেখর-ভবন ॥
নিত্যানন্দ গদাধর অদ্বৈত শ্রীবাস।
বিদ্যানিধি মুরারি হিরণ্য হরিদাস ॥
গঙ্গাদাস বনমালী বিজয় নন্দন।
জগদানন্দ বুদ্ধিমন্ত খান নারায়ণ ॥
কাশীশ্বর বাসুদেব রাম গরুড়াই।
গোবিন্দ গোবিন্দানন্দ সকল তথাই ॥
গোপীনাথ জগদীশ্বর শ্রীমান্ শ্রীধর ॥
সদাশিব বক্রেশ্বর শ্রীগর্ভ শুক্লাম্বর ॥
ব্রহ্মানন্দ পুরুষোত্তম সঞ্জয়াদি যত।
অনন্ত চৈতন্য-ভৃত্য নাম জানি কত ॥

এই যে দুই মহাত্মার বাটীতে সঙ্কীর্ত্তন হইতে লাগিল, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীবাস পণ্ডিত বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতে সাক্ষাৎ নারদ মুনির প্রকাশ ছিলেন, আর শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য নিশাপতি চন্দ্রের প্রকাশ ছিলেন এবং তিনি সম্পর্কে মহাপ্রভুর মেসো

হইতেন। ক্রমে ক্রমে এই সঙ্কীর্ত্তন-তরঙ্গ বাড়িতে লাগিল। তখন আর প্রভু আপনাকে লুকাইতে পারিলেন না। তখন যদিও তাঁহার মধ্যে মধ্যে ভক্তভাব হইত ও যদিও তিনি আপনাকে দীনাতিদীন দেখাইতেন, তথাপি তাঁহার ভগবদ্ভাব ভক্তগণের প্রতি পূর্ণরূপে প্রতিভাত হইত। ভক্তগণের নিকট ভগবানের আপনাকে লুকাইবার কি যো আছে? তিনি যত কেন গোপন করিবার চেষ্টা করুন না, ভক্ত তাঁহাকে জানিতে পারিবেই পারিবে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীকবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে এক স্থলে বলিয়াছেন; যথা—

আপনা লুকাইতে প্রভু নানা যত্ন করে।
তথাপি তাঁহার ভক্ত জানয়ে তাহারে॥

ঐ শ্রীবাস-অঙ্গনে যে সঙ্কীর্ত্তন হইত, তাহাতে মহাপ্রভুর নিজের নৃত্য তো অতুল্যই ছিল, শ্রীপাদ বক্রেশ্বরের নৃত্যও তৎ-সদৃশ। ঐ সময় অবধি মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণ-কাল পর্য্যন্ত যে অদ্ভুত নানারূপ নবদ্বীপ-লীলা-রহস্য, তৎসমুদায় শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি বিবিধ শ্রীগ্রন্থনিচয়ে অতি বিস্তারিতরূপে বর্ণিত আছে এবং ইদানীন্তন কালে ভক্তপ্রবর শ্রীল শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় প্রভুর কৃপাবলে শক্তিবিশিষ্ট হইয়া তাঁহার রচিত "অমিয় নিমাই চরিত" গ্রন্থে অতি অমিয় ভাষায় বর্ণন করিয়াছেন। এজন্য এ ক্ষুদ্র পুস্তিকায় সে সকল বর্ণন করা নিষ্প্রয়োজন, বিশেষতঃ ঐ সময়ের মধ্যে শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার কথা কোন প্রাচীন শ্রীগ্রন্থাদিতে দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, ঐ সময়ে শ্রীমৎ বক্রেশ্বর

পণ্ডিত-প্রভু শ্রীমদ্ গৌরাঙ্গ দেবের নিত্যসেবক স্বরূপ ছিলেন এবং মহাপ্রভুর অবতারের যে প্রধান কার্য্য—প্রেমদান ও ভক্তিশিক্ষা দ্বারা পাতকী উদ্ধার করা, সে সম্বন্ধে নিতাই, হরিদাস প্রভৃতির সহিত তিনিও একজন প্রধান সহায় ছিলেন, এবং সেই কারণেই তিনি শ্রীচৈতন্যরূপ প্রেম-কল্পতরুর একটী বড় শাখা বলিয়া পরিগণিত।

মহাপ্রভু যে নূতন কীর্ত্তন প্রচার করিলেন, তাহার যে কি মধুরত্ব ও প্রভাব ছিল, তাহা বর্ণন করা একপ্রকার অসাধ্য। তদ্দ্বারা যে কি অলৌকিক ব্যাপার সকল সাধিত হইয়াছিল, সে বিষয় শ্রীগ্রন্থাদিতে ও "অমিয় নিমাই-চরিতে" বিশেষরূপে বর্ণিত আছে। সঙ্কীর্ত্তনের অঙ্গ তিনটী—নৃত্য, গীত ও বাদ্য। ঐ তিনেরই ঐক্য হওয়া চাই, নচেৎ সঙ্কীর্ত্তনকারীদের মধ্যে পূর্ণানন্দের উদয় হয় না ও দর্শকবৃন্দেরও আনন্দ জন্মে না। ঐ তিনটী অঙ্গ পরস্পরের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়া থাকে। বাদ্য নৃত্য ও গীতকে নাচাইয়া তুলে, নৃত্য দ্বারা গীতের পরিপুষ্টি সংসাধিত হয়, এবং গীত দ্বারা নৃত্যে নৃত্যকারীকে মাতাইয়া ফেলে। শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রচারিত ঐ নূতন সঙ্কীর্ত্তনের সঙ্গে প্রভু শ্রীমৎ বক্রেশ্বর পণ্ডিতের একটু বিশেষ সম্বন্ধ থাকা দেখিতে পাওয়া যায়, এইজন্য এস্থলে তদ্বিষয়ে দু'এক কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ঐ কীর্ত্তনের মধ্যে প্রধান নৃত্যকারী ছিলেন দুই জন—এক তো স্বয়ং শ্রীগৌরাঙ্গ আর দ্বিতীয় শ্রীবক্রেশ্বর। উভয়ে উভয়ের নৃত্যে সমান আনন্দিত হইতেন। বক্রেশ্বর নৃত্য আরম্ভ করিলে গৌরসুন্দর আর থাকিতে পারিতেন না,—নিজে অমনি গীত আরম্ভ করিতেন, এবং তিনি নিজে গান না করিলে বক্রেশ্বরের ততটা নৃত্যসুখ হইত না; আবার মহা-

প্রভু নৃত্য আরম্ভ করিলে বক্রেশ্বর অমনি গান ধরিতেন। যথা—

বক্রেশ্বরে নৃত্যতি গৌরচন্দ্রো
গায়ত্যমন্দং করতালিকাভিঃ।
বক্রেশ্বরো গায়তি গৌরচন্দ্রে
নৃত্যত্যসৌ তুল্যসুখানুভূতিঃ ॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক।

অন্বয়ার্থঃ—"বক্রেশ্বরের নৃত্যে গৌরচন্দ্র করতালিকা প্রদান-পূর্ব্বক তারস্বরে গান করেন, এবং গৌরচন্দ্রের নৃত্যে বক্রেশ্বরও গান করেন, এইরূপে উভয়ে সমান সুখানুভব করিতে লাগিলেন।"

নৃত্যক্রিয়াটী বড়ই নয়নপ্রীতিকর ও চিত্তরঞ্জন। সামান্য নৃত্য দেখিলেই যখন মানুষের মনে আহ্লাদ অনুভূত হইয়া থাকে, তখন ভগবৎপ্রেমে আপ্লুত হইয়া সাত্ত্বিক ভাবাবেশে পরমানন্দ-পরিচায়ক যে নৃত্য, তাহাতে মনকে যে মুগ্ধ করিবে সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি হইতে পারে? বক্রেশ্বরের ঐরূপ অষ্টসাত্ত্বিক ভাবাবেশের নৃত্যে, মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, দেবতা অসুর প্রভৃতিও মোহিত হইতেন এবং তাঁহার নৃত্য দর্শন করিলে অতি বড় পাষণ্ডীও কৃষ্ণপরায়ণ হইয়া যাইত। শ্রীবৃন্দাবন দাস গোস্বামী শ্রীচৈতন্যভাগবতে এক স্থলে তাঁহার নৃত্যমহিমা বর্ণন করিয়াছেন। যথা—

নিরবধি কৃষ্ণপ্রেমে বিগ্রহ বিহ্বল।
যাঁর নৃত্যে দেবাসুর মোহিত সকল ॥
অশ্রু কম্প স্বেদ হাস্য পুলক হুঙ্কার।
বৈবর্ণ্য আনন্দ মূর্চ্ছা আদি যে বিকার ॥

চৈতন্য-কৃপায় মাত্র নৃত্যে প্রবেশিলে।
সকলে আসিয়া বক্রেশ্বর দেহে মিলে॥
বক্রেশ্বর পণ্ডিতের উদ্দাম বিকার।
সকল কহিতে শক্তি আছয়ে কাহার॥

শ্রীমৎ বক্রেশ্বর পণ্ডিত-প্রভুর ঐ অতুল্য নৃত্যমহিমা বর্ণন করিবার শক্তি কি আমাদের মত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জীবের থাকিতে পারে? শ্রীকবিকর্ণপূর শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের এক স্থলে সেই আশ্চর্য্য মনোমুগ্ধকর ও নয়নরসায়ন নৃত্য যেরূপে বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতে কতক পরিমাণে সেই নৃত্যের পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। শ্রীবাস-অঙ্গনে সংকীর্ত্তন হইতেছে, এমন সময় গঙ্গাদাস শ্রীমদদ্বৈতদেবের অনুসন্ধানে গমন করিতে করিতে, শ্রীবাস-ভবনের সমীপে ভক্তগণের সেই অসীম আনন্দদায়ী সংকীর্ত্তন-কোলাহল শ্রবণ করিয়া সেই দিকে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন যে, সকলেই সংকীর্ত্তন করিয়া ভগবান্ বিশ্বম্ভরদেবকে নৃত্য করাইতেছেন এবং আপনারাও নৃত্য করিতেছেন। প্রথমেই মহাপ্রভুর নৃত্য দর্শন করিয়া গঙ্গাদাস কহিলেন, যথা—

শ্লোকার্থ—"আহা! যাঁহার গভীরতর হুঙ্কার ধ্বনিতে নিখিল ভক্তবৃন্দ ময়ূরবৎ নৃত্য করিতেছেন, এবং যাঁহার নিরন্তর বিনিঃসৃত নয়ন-নীরে ত্রিভুবন যেন দুর্দ্দিনের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইতেছে ও যাঁহার শ্রীঅঙ্গের অপূর্ব্ব কান্তিকলাপে চতুর্দ্দিক্ যেন সৌদামিনী-মালায় পরিবৃত হইতেছে, সেই এই বিশ্বম্ভরদেব সম্মুখভাগে নৃত্য করিতেছেন।"

পরে শ্রীবক্রেশ্বরের নৃত্য দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিতেছেন, যথা—

শ্লোকার্থ—"আহা! এ কি পরমানন্দের মূর্ত্তি! এ কি মূর্ত্তি-মান্ প্রেমরস, না শ্রদ্ধা ও দয়া দেহধারণ করত ভূতলে আসিতেছে? না কি মাধুর্য্যেরই মূর্ত্তি! কিংবা নববিধা ভক্তি একত্র মিলিত হইয়া একটী শরীর ধারণ পূর্ব্বক আসিতেছে? না তাহা নয়, ইনি বক্রেশ্বর পণ্ডিত ভগবানের সদৃশ আবেশ-সুখে বিনিমগ্ন হইয়া নৃত্য করিতেছেন"। ধন্য ধন্য প্রভু বক্রেশ্বর!

শ্রীপণ্ডিত-প্রভুর যে প্রেমানন্দব্যঞ্জক নৃত্য, তাহাতে তিনি একেবারেই বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া যাইতেন ও আহার নিদ্রাদি পরিত্যাগ করিয়া এক ভাবে অবিরাম চব্বিশ প্রহর কাল কৃষ্ণাবেশে নৃত্য করিতেন। যথা—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

বক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রভুর বড় প্রিয় ভৃত্য।
একভাবে চব্বিশ প্রহর যাঁর নৃত্য॥

তাঁহার নৃত্যে কোন বিরাম থাকিত না, কাজেই তাঁহার ঐ নৃত্যকাল পর্য্যন্ত কীর্ত্তনও ভঙ্গ হইতে পারিত না। এক্ষণে যে আমরা ২৪ প্রহর কীর্ত্তনের কথা শুনি—যাহাতে শত সহস্র ভক্ত বৈষ্ণবগণ একত্র এক স্থানে মিলিত হইয়া নিয়মপূর্ব্বক অবিচ্ছেদে এক সম্প্রদায়ের পর অন্য সম্প্রদায়-ক্রমে চব্বিশ প্রহরকাল গগনভেদি নামসংকীর্ত্তন করিয়া থাকেন,—তাহা শ্রীবক্রেশ্বরের ২৪ প্রহর নৃত্য হইতেই সৃষ্ট হইয়াছে। ধন্য প্রভু বক্রেশ্বর! ধন্য তোমার এই অপূর্ব্ব সংকীর্ত্তন সৃষ্টিলীলা!!

বক্রেশ্বরের নৃত্যের সঙ্গে ঐক্যভাবে সংকীর্ত্তন করিবার ক্ষমতা মহাপ্রভু ভিন্ন আর কাহারও ছিল না। তিনি নাচিতে নাচিতে মহাপ্রভুকে বলিতেন যে, সহস্র সহস্র গন্ধর্ব্ব আমার সহিত গান না করিলে আর আমার নৃত্যসুখ হয় না। যথা—

সহস্রগায়কান্ মহ্যং দেহি ত্বং করুণাময়।
ইতি চৈতন্যপাদে স উবাচ মধুরং বচঃ॥

তথাহি শ্রীভক্তমালে—

কৃষ্ণাবেশে নৃত্য প্রভু সুখ লাগি মাগে।
সহস্র গায়ক নিজ সহ অনুরাগে॥

শ্রীগৌরাঙ্গদেবও প্রিয় ভৃত্যের প্রার্থনা পূরণ জন্য শতসহস্র-গন্ধর্ব্ব-গর্ব্ব-খর্ব্বকারী সঙ্গীতসুধা নিজে বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিতেন। তিনি ভিন্ন আর বক্রেশ্বরের নৃত্যের সমতুল্য কীর্ত্তনীয়া কে হইতে পারে?

যে নাচিতে কীর্ত্তনীয়া শ্রীগৌরসুন্দর॥

শ্রীচৈতন্যভাগবত।

তথাহি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

আপনে মহাপ্রভু গায় যাঁর নৃত্যকালে।
প্রভুর চরণ ধরি বক্রেশ্বর বলে॥
দশ সহস্র গন্ধর্ব্ব মোরে দেহ চন্দ্রমুখ।
তারা গায় মুঞি নাচো তবে মোর সুখ॥

শ্রীপণ্ডিত-প্রভুর নৃত্যের এত গুণ না হইবে কেন? যখন তিনি অষ্টসাত্ত্বিক-ভাবাপন্ন হইয়া নৃত্য করিতেন, তখন হরি নিজেই তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিতেন। প্রবেশই বা বলি কেন, কৃষ্ণ তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদাই তো বিরাজমান ছিলেন; সুতরাং তাঁহার যে নৃত্য, তাহা শ্রীকৃষ্ণেরই নৃত্য বুঝিতে হইবে। যথা—শ্রীচৈতন্যভাগবতে—

বক্রেশ্বর-হৃদয়ে কৃষ্ণের নিজ ঘর।
কৃষ্ণ নৃত্য করেন নাচিলে বক্রেশ্বর॥

এই জন্যই বক্রেশ্বরের নৃত্য শ্রীচৈতন্যরূপী শ্রীকৃষ্ণেরই নৃত্যের সদৃশ ছিল—ইহাই তাঁহার নৃত্যের বিশেষত্ব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, শ্রীগৌরাঙ্গদেবের নবদ্বীপ-লীলারহস্য নানা শ্রীগ্রন্থাদিতে বিস্তৃত রূপে বর্ণিত হইয়াছে, এ ক্ষুদ্র পুস্তিকায় তাহার আর বর্ণন করিবার প্রয়োজন নাই। বিশেষতঃ সে অদ্ভুত লীলা বর্ণন করিতে শক্তিমান্ ভক্তগণের লেখনীই সমর্থ, আমার মত ক্ষুদ্র জীবের ক্ষমতার তাহা একেবারেই অতিরিক্ত। তবে কেবল ঐ লীলারহস্যের মধ্যে যে যে স্থানে শ্রীপণ্ডিত প্রভু বক্রেশ্বরের কিছু কিছু সম্বন্ধ শ্রীগ্রন্থাদিতে প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাই যথাসাধ্য কতক কতক লিখিবার চেষ্টা করা হইল মাত্র।

মহাপ্রভু কিছুদিন নবদ্বীপ ধামে বিহার করত নানা লীলা প্রকাশ করিয়া, লোকশিক্ষা ও জীবোদ্ধার জন্য অবশেষে পুত্রপ্রাণা বৃদ্ধা জননী ও পতিরতা যুবতী প্রণয়িনীকে কাঁদাইয়া সংসারাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং সেই উদ্দেশে একদিন রাত্রিকালে সকলের অজ্ঞাতে নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া কাটোয়ায় শ্রীকেশবভারতী ঠাকুরের নিকট সন্ন্যাস ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার মানসে তথায় প্রস্থান করিলেন। পরদিন প্রাতে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রস্থান-বার্ত্তা প্রকাশ হইলে, নদীয়াবাসী ভক্তগণ একেবারে শোকসাগরে নিমগ্ন হইলেন। অবশ্য, শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর যে শোক উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। ভক্তগণ সকলে মিলিত হইয়া পরামর্শ স্থির করিতে লাগিলেন, যদি কাটোয়া গিয়া

প্রভুকে ফিরাইয়া আনিতে পারেন। সকল ভক্তেরই মনের অবস্থা সমান, সকলেই প্রভুর বিরহে একেবারে অধীর, সকলেই প্রভুকে আনিতে যাইবার জন্য ব্যগ্র ও প্রস্তুত। কিন্তু বিজ্ঞ শ্রীবাস পণ্ডিত বিবেচনা করিলেন যে, সকলে নদীয়া পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে প্রভুর বাটী ঘর কে রক্ষা করিবে, এবং শোক-সন্তপ্তা শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীদ্বয়েরও রক্ষণাবেক্ষণ কার্য্য চলিবে না। এই জন্য সকলকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, সকলের এ সময় যাওয়া উচিত নহে। প্রধান প্রধান জনকয়েক গেলেই হইতে পারিবে। অবশেষে শ্রীবাস পণ্ডিতের উপদেশ মতে সকলে স্থির করিলেন যে, প্রধান প্রধান পাঁচ জনই গমন করুন। যথা—শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে—

তবে সব ভক্তগণ করি অনুমান।
মুখ্য মুখ্য জন পাঁচ করিল পয়ান॥

যে পাঁচ জন প্রধান ভক্ত কাটোয়া যাইবার জন্য মনোনীত হইলেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতও একজন ছিলেন। যে পাঁচ জন গমন করিলেন, তাঁহাদের নাম—নিতাই, বক্রেশ্বর, মুকুন্দ, চন্দ্রশেখর এবং দামোদর। যথা—শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে—

চন্দ্রশেখর আচার্য্য পণ্ডিত দামোদর।
বক্রেশ্বর আদি করি চলিল সত্বর॥
এই সব লই নিত্যানন্দ চলি যায়।
প্রবোধিয়া শচী বিষ্ণুপ্রিয়ার হৃদয়॥

যদিও প্রথম দিন ঐ পাঁচজন ভক্ত কাটোয়া যাত্রা করিলেন বটে, কিন্তু পরদিন আর দুই জন ভক্তের প্রভু-বিচ্ছেদয

একেবারে অসহ্য হওয়ায় তাঁহারাও আর থাকিতে পারিলেন না—রুদ্ধশ্বাসে কাটোয়াভিমুখে দৌড় মারিলেন। ঐ দুই ভক্ত—গদাধর ও নরহরি। যথা—

নবদ্বীপ হ'তে গদাধর নরহরি।
আসিয়া মিলিল তারা বলি হরি হরি ॥

কাটোয়ায় প্রভুর সহিত ভক্তগণের মিলনবৃত্তান্ত, তাঁহাদের প্রভুকে নদীয়া লইয়া যাইবার জন্য অনুনয় বিনয়াদি, তাঁহাদের নিকটে প্রভুর দীনভাবে ক্ষমা প্রার্থনা, প্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণ-প্রতিজ্ঞা শ্রবণে কাটোয়ায় লোকসংঘর্ষ ও তাহাদের শোক-প্রকাশাদি বিবিধ বিষয় "অমিয় নিমাইচরিত" গ্রন্থে যে-রূপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে অতি বড় পাষণ্ডীও চক্ষের জল সংবরণ করিতে পারে না। প্রভুর কৃপাবলে শক্তি-বিশিষ্ট না হইলে সেরূপ বর্ণনা কাহারও লেখনীপ্রসূত হইবার যো কি? গৌরভক্ত বৈষ্ণবগণের প্রতি কোনরূপ অনুরোধ-বাক্য প্রয়োগ করা আমার মত অধমের পক্ষে ধৃষ্টতার পরি-চায়ক; তবে সাধারণ পাঠকগণের মধ্যে যাঁহারা গৌরাঙ্গদেবের সন্ন্যাসগ্রহণ-লীলা যে কি ব্যাপার তাহা জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের নিকট আমার সানুনয় নিবেদন যে, তাঁহারা পরম-শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাবু শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের ঐ অতুল্য গ্রন্থের ঐ অংশ একবার পাঠ করিয়া দেখিবেন।

প্রভুর ভক্তগণ যাহা মনে করিয়া নবদ্বীপ হইতে আসিয়াছিলেন, তাহা তো ঘটিল না—তাঁহারা কোনক্রমেই প্রভুকে সন্ন্যাসগ্রহণ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিলেন না। অবশেষে যখন প্রভু ভারতী গোসাঁইর নিকট সন্ন্যাসমন্ত্র গ্রহণ

করিয়া সন্ন্যাসিবেশে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া উন্মত্তভাবে পশ্চিমদিকে রাঢ় দেশাভিমুখে চলিলেন, তখন ভক্তগণ আর কি করিবেন! তাঁহাদের মধ্যে নিত্যানন্দ, আচার্য্যরত্ন ও মুকুন্দ—ইঁহারা তিনজনে প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে গমন করিতে লাগিলেন। যথা—

নিত্যানন্দ আচার্য্যরত্ন মুকুন্দ তিন জন।
প্রভু পাছে পাছে তিনে করেন গমন॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

আর বক্রেশ্বর, গদাধর প্রভৃতি অবশিষ্ট কয়েকজন একেবারে শোকে অধীর হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের সে সময়ের অবস্থা কি বর্ণনা করা যায়? শ্রীকৃষ্ণের মথুরা যাইবার সময় ব্রজগোপীগণ যেরূপ ব্যগ্রতাসহকারে পথে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের রথ আটকাইয়াছিলেন, এবং তাহাতেও শ্রীকৃষ্ণকে রাখিতে না পারিয়া তাঁহাদের সে সময় যে দশা উপস্থিত হইয়াছিল, প্রভুকে নবদ্বীপে ফিরাইয়া লইতে না পারায় ও প্রভু সন্ন্যাস পরিগ্রহ করায়, তাঁহার ভক্তগণেরও সেই সময় সেই দশা উপস্থিত হইল। বিশেষতঃ শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত, মহাপ্রভুর সন্ন্যাসবেশ দর্শন করিয়াই, একেবারে অচেতন হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। পরম রমণীয় নিমাই পণ্ডিত-রূপই তাঁহার নয়নরঞ্জন করিত, তিনি কি আর প্রভুর ঐরূপ সন্ন্যাসবেশ দেখিতে পারেন? তিনি প্রভুকে মাধুর্য্যভাবেই ভজনা করিতেন। সন্ন্যাসীর বেশে মনে কতকটা ঐশ্বর্য্যভাবের উদয় করিয়া দেয়; ঐশ্বর্য্যভাবে ভগবানের উপাসনা শ্রীবক্রেশ্বরের তত ভাল লাগিত না।

বক্রেশ্বর প্রভৃতি ভক্তগণ যখন কিঞ্চিৎ চৈতন্য প্রাপ্ত হইলেন, তখন আর তাঁহারা কি করেন—অতি বিষণ্ণহৃদয়ে নবদ্বীপে

ফিরিয়া চলিলেন। কয়েক দিন পরে যখন নদীয়াবাসী ভক্তগণ শুনিলেন যে, প্রভু নিত্যানন্দ মহাপ্রভুকে শান্তিপুরে অদ্বৈতালয়ে ফিরাইয়া আনিয়াছেন, তখন তাঁহারা সকলেই শূন্যদেহে আবার প্রাণ পাইয়া প্রভুকে দর্শন করিবার জন্য শান্তিপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যে কয়দিন প্রভু শান্তিপুরে অদ্বৈতালয়ে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, সেই কয়দিন শ্রীবক্রেশ্বর প্রভৃতি ভক্তগণ প্রভুর সহিত মিলিত হইয়া পরমানন্দে দিন কাটাইয়াছিলেন। অবশেষে যখন প্রভু নীলাচলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, তখন ভক্তগণের প্রভুবিরহ-যন্ত্রণানল আবার প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তাঁহারা কি আর গৌরশূন্য নদীয়ায় থাকিতে পারেন? প্রভুকে কোন মতেই রাখিতে না পারিয়া, তাঁহারা সকলেই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তাঁহারা প্রভুর সহিত নীলাচলে গমন করিবেন; এবং প্রভুকেও তাঁহাদের মনের কথা জানাইয়া অনুনয় বিনয়সহকারে বলিতে লাগিলেন—যেন প্রভু তাঁহাদিগকে নিরাশ না করেন,—সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। কিন্তু মহাপ্রভু কৌশলে তাঁহাদের অনেক বুঝাইয়া সুঝাইয়া এবং পরে তাঁহার সহিত পুনর্ব্বার মিলনের আশায় আশ্বস্ত করিয়া, আপন আপন গৃহে গমন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিতে উপদেশ প্রদান করিলেন ও তাঁহার সঙ্গে যাইতে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। যথা—শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে—

আর দিন প্রভু কহে সব ভক্তগণে।
নিজ নিজ গৃহে সবে করহ গমনে॥
ঘরে গিয়া কর সবে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন।
পুনরপি আমা সঙ্গে হইবে মিলন॥

কভু বা করিবে তোমরা নীলাদ্রি গমন।
কভু বা আসিব আমি করিতে গঙ্গাস্নান॥

প্রভু যখন হাসিয়া হাসিয়া ভক্তগণকে বুঝাইলেন,—কি যে সে হাসির অদ্ভুত প্রভাব!—ভক্তগণ আশ্বস্ত হইয়া নিরস্ত হইয়া রহিলেন। পরে প্রভুর গমনের কাল উপস্থিত হইলে, সমভিব্যাহারী ভক্তগণ ব্যতীত, আর সকল ভক্তগণকে আলিঙ্গন করিয়া তিনি সকলের নিকট পৃথক্ পৃথক্ রূপে বিদায় গ্রহণ করিলেন। যথা— শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

একে একে মিলিলা প্রভু সব ভক্তগণ।
সবার মুখ দেখি করে দৃঢ় আলিঙ্গন॥
শ্রীবাস রামাই বিদ্যানিধি গদাধর।
গঙ্গাদাস বক্রেশ্বর মুরারি শুক্লাম্বর॥
বুদ্ধিমন্ত খান নন্দন শ্রীধর বিজয়।
বাসুদেব দামোদর মুকুন্দ সঞ্জয়॥
কত নাম লব যত নবদ্বীপবাসী।
সবারে মিলিলা প্রভু কৃপাদৃষ্টে হাসি॥

প্রভু প্রথমে একলা যাইবার জন্যই প্রস্তুত ছিলেন; কিন্তু শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের বিশেষ অনুরোধে চারিজন উদাসীন ভক্তকে সঙ্গে লইয়া যাইতে সম্মত হইলেন। তদনুসারে নিতাই, জগদানন্দ, দামোদর ও মুকুন্দ—এই চারিজন প্রভুর সঙ্গে চলিলেন। যথা—

নিত্যানন্দ গোসাঞী পণ্ডিত জগদানন্দ।
দামোদর পণ্ডিত আর দত্ত মুকুন্দ॥
এই চারিজন আচার্য্য দিল প্রভু সনে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

প্রভুর ভক্তগণের মধ্যে কতকগুলি গৃহী ছিলেন, আর কতক-গুলি উদাসীন ছিলেন—তাঁহাদের স্ত্রীপুত্র পরিবার কি ঘরবাড়ী কিছুই ছিল না। যে চারি জন প্রথমে প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে গমন করেন, তাঁহারা সকলেই ঐরূপ উদাসীন ভক্ত। তাঁহাদের মত শ্রীবক্রেশ্বর প্রভৃতি আরও কয়েক জন মর্ম্মী ভক্ত উদাসীন ছিলেন; তাঁহারাও কিছু দিন পরে নীলাচলে গমন করিয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন এবং তারপর বরাবরই নীলাচলে প্রভুর সহিত থাকিয়া প্রভুর সেবায় রত ছিলেন। অবশ্য, তাঁহারা যে কিছু দিন পরে নীলাচলে গমন করিয়া প্রভুর নিত্যসঙ্গী স্বরূপে অবস্থিতি করিবেন, তাহা অন্তর্যামী প্রভুর অবিদিত ছিল না, তবে কেন যে নীলাচলে প্রথম যাইবার সময় তাঁহাদের সঙ্গে করিয়া লইলেন না,—অল্প দিনের জন্য নবদ্বীপে রাখিয়া গেলেন, লীলাময়ের সে লীলারহস্য ভেদ করা আমাদের মত ক্ষুদ্র জীবের অধিকারের সম্পূর্ণরূপে অতীত। তবে শ্রীবক্রে-শ্বর পণ্ডিত সম্বন্ধে যেন একটা উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া আমাদের অনুমান হয়। আমরা যতদূর বুঝিতে পারি, তাহাতেই বোধ হয়, যেন প্রভুর উদ্দেশ্য ছিল—একজন কৃপাপাত্র জীবকে কৃষ্ণ-প্রেম প্রদান দ্বারা উদ্ধার করা ও সাধুসঙ্গের মহিমা জলন্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা আপামর জীবদিগকে শিক্ষা দেওয়া। শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত দ্বারা ঐ উদ্দেশ্য কিরূপে সংসাধিত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, মহাপ্রভুর নীলাচলে গমনের পর বক্রেশ্বর কিছু দিন দেবানন্দ পণ্ডিত নামে এক ব্রাহ্মণের গৃহে বাস করিয়াছিলেন, এবং নিজ সঙ্গগুণে তাঁহাকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। এই দেবা-নন্দ-বৃত্তান্ত সাধুসঙ্গের অপার মহিমার একটী জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। অতএব দেবানন্দ পণ্ডিত ব্যক্তিটী কে ও কিরূপে তিনি প্রথমে

অতিশয় ভক্তিবিমুখ থাকিয়াও পরে পরম বৈষ্ণব-চূড়ামণি হইয়াছিলেন, শ্রীবক্রেশ্বর-মহিমার মধ্যে সেই বিষয়ের একটু বিস্তারিত বিবরণ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হইতেছে; এই জন্য দেবানন্দ-উপাখ্যানটী যথাসাধ্য শ্রীগ্রন্থাদি অবলম্বনে লিখিত হইল।

দেবানন্দ-উপাখ্যান

প্রথম অংশ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের কিছুকাল পূর্ব্বে নবদ্বীপবাসী জনসাধারণের অতি ভক্তিশূন্য অবস্থা ছিল। সে সময় অতি অল্পসংখ্যক লোকই বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁহারাই পরে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রথম প্রধান পারিষদগণ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান, প্রবীণ, জ্ঞানী ও বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন—শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য। ঐ আচার্য্যের ভক্তগোষ্ঠীর মধ্যে শ্রীবাসপণ্ডিত একজন প্রধান ছিলেন। ইঁহারা চারি ভাই; শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের জন্মগ্রহণের পূর্ব্ব হইতেই ভক্তিপথাবলম্বী ছিলেন এবং প্রতি রজনীতে আপন বাটীতে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতেন। সে সময় নবদ্বীপ যবন নরপতি কর্ত্তৃক শাসিত ছিল। ভক্তিশূন্য নদে-বাসী অপর সকল জনগণ ঐ শ্রীবাস পণ্ডিত এবং তাঁহার ভ্রাতৃগণের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট ছিল। এক তো ভক্তিশূন্যতাহেতুক ঐরূপ উচ্চ হরিনামকীর্ত্তন তাহাদের ভাল লাগিত না,—অতিশয় শ্রুতিকঠোর বোধ হইত; দ্বিতীয়তঃ তাহারা মনে করিতে যে,

দুর্দ্দান্ত যবন শাসনকর্ত্তা ঐরূপ ব্যাপারে সমস্ত নগরবাসিগণের উপরই বিরক্ত হইয়া কোন কঠিন আজ্ঞা প্রচার করিতে পারেন, এই জন্য তাহারা শ্রীবাসের অনিষ্ট সাধন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল, এবং তাঁহাকে পরিজনসহিত নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়াই উচিত বিবেচনা করিয়া তদ্বিষয়ে যুক্তি পরামর্শ করিত। যথা—শ্রীচৈতন্যভাগবতে—

চারি ভাই শ্রীবাস মিলিয়া নিজ ঘরে।
নিশা হৈলে হরিনাম গায় উচ্চৈঃস্বরে॥
শুনিয়া পাষণ্ডী বলে হইল প্রমাদ।
এ ব্রাহ্মণ করিবেক গ্রামের উৎসাদ॥
মহাতীব্র নরপতি যবন ইহার।
এ আখ্যান শুনিলে প্রমাদ নদীয়ার॥
কেহ বলে এ ব্রাহ্মণে এই গ্রাম হ'তে।
ঘর ভাঙ্গি ঘুচাইয়া ফেলাইমু স্রোতে॥
এ ব্রাহ্মণে ঘুচাইলে গ্রামের মঙ্গল।
অন্যথা যবনে গ্রামে করিবেক বল॥

ঐ যে পাষণ্ড-দলের উল্লেখ করা হইল, তন্মধ্যে কেবলই যে অজ্ঞ, দুর্দ্দান্ত, বিদ্যাশূন্য লোকই ছিল এমন নহে; অনেক জ্ঞানগর্ব্বিত, বড় পণ্ডিত বলিয়া গণনীয় ব্যক্তিরও অভাব ছিল না। ঐ পণ্ডিতমণ্ডলীর উচ্চ হরিনামসঙ্কীর্ত্তন তাঁহাদের কিছুমাত্র ভাল লাগিত না, তাঁহারা বলিতেন "এ বেটাদের কি রকম ভজনপদ্ধতি! হরিনাম করিতে হয় তো লোকে নির্জ্জনে আপন ঘরে বসিয়াই হরিনাম করে, ইহাদের মত হরিনাম করা তো

কখনও শুনি নাই এবং কোথাও দেখি নাই। উৎকট চীৎকার-শব্দ করিয়া এ কিপ্রকার হরিনাম !! আবার মধ্যে মধ্যে কান্না-কাটি !! ইহাদের তো সকলই বাড়াবাড়ি। ইহাদের জ্বালায় রাত্রিতে নিদ্রা যাইতে পারি না।" ঐ নবদ্বীপে দেবানন্দ পণ্ডিত নামে একজন বিখ্যাত ভাগবতের পণ্ডিত বাস করিতেন। তিনি প্রসিদ্ধ সার্ব্বভৌমের পিতা মহেশ্বর বিশারদের প্রতিবেশী ছিলেন। তিনি ঐরূপ ভক্তিশূন্য পণ্ডিতগণের মধ্যে ঐ সময়ে জ্ঞানবান্, নিষ্ঠাবান্ ও চিরকুমার এবং একজন ভাগবতশাস্ত্রাধ্যাপক বড় পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত্যাপন্ন ছিলেন। তাঁহার চতুষ্পাঠীতে অনেক ছাত্র ভাগবত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিত। কিন্তু তিনি ভাগবতের ভক্তিপক্ষে ব্যাখ্যা কিছুই করিতে পারিতেন না এবং এত বড় পণ্ডিত হইয়াও ভাগবতের যথার্থ মর্ম্ম বুঝিতেন না। যথা—শ্রীচৈতন্যভাগবতে—

সেইখানে দেবানন্দ পণ্ডিতের বাস।
পরম সুশান্ত বিপ্র মোক্ষ অভিলাষ॥
জ্ঞানবন্ত তপস্বী আজন্ম উদাসীন।
ভাগবত পড়ান তথাপি ভক্তিহীন॥
ভাগবতে মহা অধ্যাপক লোকে ঘোষে।
মর্ম্ম অর্থ না জানেন ভক্তিহীন দোষে॥

কথা সত্যই বটে, ভক্তিহীন হইয়া বহু শাস্ত্র আলোচনা করিলেও শাস্ত্রের প্রকৃত রসাস্বাদন করিবার সম্ভাবনা নাই; এজন্য ভক্তিহীন পণ্ডিতের সহিত দর্ব্বীর তুলনা অনেক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। লোকে দর্ব্বী দ্বারা অনেক প্রকার সুরস মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া থাকে, দর্ব্বী সেই মিষ্টান্নে মাথাচোকা হইয়া

অনেক নাড়াচাড়া করে; কিন্তু দর্ব্বী সেই মিষ্টান্নের মধুর স্বাদ আস্বাদন কি করিতে পারে? দেবানন্দ পণ্ডিতও তেমনি ভক্তিগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকৃত মর্ম্ম আস্বাদনে অনধিকারী ছিলেন।

একদা উক্ত শ্রীবাস পণ্ডিত মহোদয় ভাগবত শ্রবণার্থ ঐ দেবানন্দের চতুষ্পাঠীতে উপস্থিত হইলেন। পরম প্রেমিক ভক্তপ্রবর শ্রীবাস সেখানে ভাগবত শ্রবণ করিয়া প্রেমে একেবারে বিভোর হইয়া উঠিলেন এবং ভাবে গদ্গদচিত্ত হইয়া একেবারে বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইয়া পড়িলেন। তাঁহার ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতে লাগিল; তিনি অধিকক্ষণ আর আপনাকে সামলাইতে না পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। দেবানন্দের তরলমতি শিষ্যগণ অধ্যাপকের ভক্তিহীন ব্যাখ্যাই শুনিত, সুতরাং তাহারাও ভক্তিহীন ছিল। শ্রীবাসের ঐরূপ দীর্ঘ নিশ্বাসপতন ও উচ্চ ক্রন্দনের কারণ কি বুঝিবে? তাহারা তাঁহার ক্রন্দনশব্দে মহা বিরক্ত হইয়া উঠিল ও আপনাদের পাঠের ব্যাঘাত হইতেছে দেখিয়া এবং ঐরূপ ক্রন্দন তাহাদের পাঠের কণ্টক বিবেচনা করিয়া শ্রীবাস পণ্ডিতকে ঐ অচেতন অবস্থায় ধরিয়া লইয়া টোলের বহির্ভাগে টানিয়া ফেলিয়া দিয়া আসিয়া তবে নিশ্চিন্ত হইল। দেবানন্দ পণ্ডিতও সেখানে উপস্থিত থাকিয়া ছাত্রবৃন্দের ঐরূপ গর্হিত কার্য্য করিবার পক্ষে কোনও নিষেধ করিলেন না। বোধ হয় তাঁহার মনে ঐ কার্য্য গর্হিত বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। যথা—শ্রীচৈতন্যভাগবতে—

দৈবে এক দিন তথা গেলা শ্রীনিবাস।
ভাগবত শুনিতে করিয়া অভিলাষ॥

অক্ষরে অক্ষরে ভাগবত প্রেমময়।
শুনিয়া দ্রবিল শ্রীনিবাসের হৃদয়॥
ভাগবত শুনিয়া কান্দয়ে শ্রীনিবাস।
মহা ভাগবত বিপ্র ছাড়ে ঘন শ্বাস॥
পাপিষ্ঠ পড়ুয়া বলে হইল জঞ্জাল।
পড়িতে না পাই ভাই ব্যর্থ যায় কাল॥
পাপিষ্ঠ পড়ুয়া সব যুকতি করিয়া।
বাহিরে এড়িল লঞা শ্রীবাসে টানিয়া॥
দেবানন্দ পণ্ডিত না কৈলা নিবারণ।
গুরু যথা ভক্তিশূন্য তথা শিষ্যগণ॥

শ্রীবাস পণ্ডিত কিছুক্ষণ পরে বাহ্যজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া নিজ গৃহে চলিয়া গেলেন। এইরূপে তো দেবানন্দ পণ্ডিত নবদ্বীপ-মধ্যে এক জন বড় মাননীয় পণ্ডিত বলিয়া কাল কাটাইতে লাগিলেন এবং তত্রত্য ভক্তিবিহীন জনসাধারণের নিকট পরম মোহান্ত বলিয়াও পূজিত ছিলেন। কিছু দিন পরে কলিযুগের লোকের পরম সৌভাগ্যফলে শ্রীগৌরাঙ্গ-দেব জীব-উদ্ধার জন্য নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইলেন। কতক দিন নিমাই পণ্ডিতরূপে বিরাজ করিয়া, গয়াধাম হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর যখন তাঁহার ভগবদ্ভাব আর অন্তরঙ্গ ভক্তগণের নিকট অপ্রকাশ রহিল না, সেই সময়ে এক দিন মহাপ্রভু ভক্তগণ সহিত নগরপরি-ভ্রমণ-কালে পথে দেবানন্দ পণ্ডিতকে দেখিতে পাইলেন। পূর্ব্বে দেবানন্দ যে শ্রীবাস পণ্ডিতকে অপমানিত করিয়া-ছিলেন, অন্তর্যামী প্রভুর সেই কথা স্মরণ হইবামাত্র অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া, দেবানন্দের সম্মুখীন হইলেন ও

তাঁহাকে বহু তিরস্কার ও ভৎ´সনা করিতে লাগিলেন। প্রভু বলিলেন—

অহে অহে দেবানন্দ বলি যে তোমারে।
তুমি এবে ভাগবত পড়াও সবারে॥
যে শ্রীবাসে দেখিতে গঙ্গার মনোরথ।
হেন জন শুনিবারে গেলা ভাগবত॥
কোন অপরাধে তারে শিষ্য হাথাইয়া।
বাড়ির বাহিরে লঞা এড়িলা টানিয়া॥
ভাগবত শুনিতে যে কান্দে কৃষ্ণরসে।
টানিয়া ফেলিতে সে তাহার যোগ্য আইসে॥
বুঝিলাম তুমি সে পড়াও ভাগবত।
কোন জন্মে না জানহ গ্রন্থ-অভিমত॥
পরিপূর্ণ করিয়া যে সব জনে খায়।
তবে বহির্দ্দেশে গিয়া সে সন্তোষ পায়॥
প্রেমময় ভাগবত পড়াইয়া তুমি।
তত সুখ না পাইলা কহিলাম আমি॥

অত বড় পণ্ডিত ও সম্মানবিশিষ্ট দেবানন্দকে এইরূপে ভৎ´-সনা করিতে পারে, ঐ সময়ে নবদ্বীপের মধ্যে এমন সাধ্য আর কাহারও ছিল না। যখন মহাপ্রভুর প্রতি দেবানন্দের বিশ্বাস তত উপজাত হয় নাই, এবং যখন তিনি নিমাই পণ্ডিত একজন সামান্য লোক বলিয়াই বিশ্বাস করিতেন, তখন তিনি নবদ্বীপবাসী কোন লোকের কাছে ঐরূপ তিরস্কারবাক্য শ্রবণ করিয়া সহ্য করিবার লোকও ছিলেন না। কিন্তু কি

আশ্চর্য্য ব্যাপার! শ্রীচৈতন্যদেবের ভৎ র্সনা-বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবানন্দ পণ্ডিত লজ্জায় অবনতমস্তক হইয়া রহিলেন এবং কোনরূপ উত্তর প্রদান না করিয়া নিজ গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন, তাহার কারণ কি? এই ঘটনাটীতেই দেবানন্দের সৌভাগ্যের সূত্রপাত বলিতে হইবে। কারণ জীবের সৌভাগ্যের উদয় না হইলে আর ভগবানের দণ্ড তাহার উপর পড়ে না। সে তো প্রকৃত দণ্ড নহে, বাহিরে দেখিতে দণ্ড বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু তাহা দয়াময় লোকনাথের কৃপারই পরিচায়ক। প্রভু এই যে দেবানন্দকে বাক্যদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন, তাহার ফলে তাঁহার এতদিনের শুষ্ক, নীরস, জ্ঞানগর্ব্বিত, মরুভূমি-সদৃশ হৃদয়ক্ষেত্রের অবস্থা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া, তাহাতে ভগবানের কৃপা-বারি বর্ষণ হইল, এখন কেবল সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্যে তাহাতে ভক্তিবীজ পতিত হইলেই তাহা অঙ্কুরিত হইয়া উঠিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। দেবানন্দের সেই সময় সমাগত হইয়া আসিতেছিল, এজন্যই তিনি মৌনভাবে নিরুত্তর হইয়া বাটী প্রস্থান করিলেন। যথা—শ্রীচৈতন্যভাগবতে—

চৈতন্যের দণ্ড যে মস্তকে করি লয়।
সেই দণ্ডে তারে প্রেম ভক্তিযোগ হয়॥

আর একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তগোষ্ঠী সহিত মহেশ্বর বিশা-রদের জাঙ্গালে পরিভ্রমণ-সময়ে দেবানন্দ পণ্ডিতের টোলের নিকট যাইতে যাইতে তাঁহার ভাগবত-ব্যাখ্যা শুনিতে পাইয়া, অমনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া, তাঁহার চতুষ্পাঠীতে প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহার ভাগবতগ্রন্থ ছিঁড়িয়া ফেলিবার জন্য উদ্যত হইলে, ভক্তগণ তাঁহাকে নিরস্ত করিলেন। যথা—

দৈবে প্রভু ভক্তসঙ্গে সেই পথে যায়।
যেখানে তাহার ব্যাখ্যা শুনিবারে পায়॥
সর্ব্বভূত-হৃদয় জানয়ে সর্ব্ব তত্ত্ব।
না শুনয়ে ব্যাখ্যা ভক্তিযোগের মহত্ত্ব॥
কোপে বলে প্রভু, বেটা কি অর্থ বাখানে।
ভাগবত অর্থ কোন জন্মেও না জানে॥
এ বেটার ভাগবতে কোন্ অধিকার।
গ্রন্থরূপে ভাগবত শ্রীকৃষ্ণ অবতার।

*　　*　　*

নিরবধি ভক্তিহীন এ বেটা বাখানে।
আজি পুথি চিরি এই দেখ বিদ্যমানে॥
পুথি চিরিবারে প্রভু ক্রোধাবেশে যায়।
সকল বৈষ্ণবগণ ধরিয়া রহায়॥

মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্বে ভক্তগণ-সঙ্গে নবদ্বীপ-লীলার সময় নানা দূরদেশ হইতে কত কত ব্যক্তি যে আকৃষ্ট হইয়া ঐ প্রেম-স্পর্শমণির সমীপে উপস্থিত হইয়া প্রেমানন্দ উপভোগ করিলেন, তাঁহাদের সংখ্যা কে করিবে? কিন্তু শ্রীনবদ্বীপ ধামে বাস করিয়াও ততদিন দেবানন্দ পণ্ডিতের মনে শ্রীচৈতন্যের প্রতি কোনরূপ বিশ্বাস হয় নাই ও তিনি ঐ সকল অদ্ভুত লীলার কার্য্য দেখিয়াও দেখিতেন না। যথা—

গৃহবাসে যখন আছিলা গৌরচন্দ্র।
তখনে যতেক করিলেন দেবানন্দ॥

প্রেমময় দেবানন্দ পণ্ডিতের মনে।
নহিল বিশ্বাস না দেখিলা এ কারণে॥

শ্রীচৈতন্যভাগবত।

ইহার কারণ আর কিছুই নহে, তখনও তাঁহার সময় উপস্থিত হয় নাই। ভক্তিধন-প্রাপ্তির সময় সমাগত হইলে জীবের সাধুসঙ্গ হইয়া থাকে এবং সেই সাধুসঙ্গগুণে ক্রমে ভক্তির উদয় হয়। শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু" গ্রন্থে "আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গশ্চ ভজনক্রিয়া" ইত্যাদি শ্লোকে ভক্তি-উদয়ের ক্রম প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্লোকার্থ যথা—

"প্রথমতঃ ভগবৎকথাদিতে শ্রদ্ধা উপস্থিত হয়, 'তৎপরে সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গগুণে শ্রবণ কীর্ত্তন হয়, শ্রবণ কীর্ত্তন করিলে সর্ব্বপ্রকার অনর্থনিবৃত্তি হয়, সর্ব্বপ্রকার অনর্থ নিবারিত হইলে নিষ্ঠা হয়, সেই নিষ্ঠাই শ্রবণাদিতে রুচি উপস্থিত করে, আবার রুচি হইতে আসক্তি এবং আসক্তি হইতে চিত্তে রতির উদয় হয়, সেই রতি হইতে ভক্তির উদয় হয়।"

এই যে শ্রীপাদ রূপগোস্বামি-প্রদর্শিত ভক্তির ক্রম, তাহা আমরা দেবানন্দ পণ্ডিতের জীবনে সুন্দররূপে মিলিতে দেখিতে পাই। হইতে পারে যে, শ্রীগৌরাঙ্গের সাক্ষাৎকার-মাহাত্ম্যে ও তাঁহার বাক্যদণ্ডে দেবানন্দের মন কতকটা আর্দ্র হইয়াছিল, পরে শ্রীচৈতন্যদেবের সন্ন্যাসগ্রহণরূপ মহান্ ব্যাপারে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধার উদয় হইয়া থাকিবে; অবশেষে যখন তাঁহার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতিফলে এবং ঐ শ্রদ্ধার বলে সাধুসঙ্গ হইল, তখন সেই সঙ্গগুণে ক্রমে তাঁহার ভক্তির উদয় হইল। যে সাধুসঙ্গে দেবা-

নন্দের ঐরূপ পরিবর্ত্তন ও উন্নতি হয়, সে আর কাহারও সঙ্গ নহে, প্রভু শ্রীমৎ বক্রেশ্বর পণ্ডিতের সঙ্গ।

যখন গৌরচন্দ্র সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া নীলাচলে চলিয়া গেলেন, গৃহী ভক্তগণ তো আপনাপন বাটীতে থাকিয়া প্রভু-বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা সহ্য করিতে লাগিলেন; উদাসীন ভক্তগণের মধ্যে সেই সময় দেবানন্দের সৌভাগ্যবলে শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত তাঁহার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার ভক্তিগুণে বশীভূত হইয়া কিছুদিন তাঁহার বাটীতে বাসও করিয়াছিলেন। যথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে—

সন্ন্যাস করিয়া যদি ঠাকুর চলিলা।
তবে তান ভাগ্য হইতে বক্রেশ্বর আইলা॥

এই বক্রেশ্বর-সঙ্গ-মাহাত্ম্যে দেবানন্দের এত কালের ভক্তি-শূন্য হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের অঙ্কুর হইয়া এবং সেই অঙ্কুর ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দ-ফলধর সুন্দর বৃক্ষে পরিণত হইয়া উঠিল। শ্রীবক্রেশ্বরের মহাভাবাপন্ন সাত্ত্বিক নৃত্যাদি-দর্শনে তাঁহার প্রতি দেবানন্দের দৃঢ় শ্রদ্ধা উপজাত হইল এবং তিনি অতি ভক্তি সহকারে তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। যে বাটীতে এক সময়ে তাঁহার ভাগবতশ্রবণে প্রেমিক-হৃদয় শ্রীবাস পণ্ডিতের ক্রন্দনশব্দ বিরক্তিকর বলিয়া বোধ হইয়াছিল, সেই দেবানন্দভবনে এখন আর সঙ্কীর্ত্তনের কলরবের নিবৃত্তি নাই। ঐ সঙ্কীর্ত্তন-মধ্যে জগতে অতুল্য প্রভু বক্রেশ্বরের নৃত্য আরম্ভ হইলে, দেবানন্দের আর আনন্দের সীমা থাকিত না এবং পাছে সে নৃত্য ভঙ্গ হয়, সেইজন্য তিনি নিজে সমাগত লোক সরাইয়া দিয়া নৃত্যের স্থান পরিষ্কৃত করিয়া দিতেন। এবং যখন বক্রেশ্বর মহাভাবে আবিষ্ট হইয়া বাহ্য-

জ্ঞান-শূন্য হইয়া যাইতেন, তখন পাছে ভূমিতে পতিত হইয়া তাঁহার দেবতুল্য তপ্তকাঞ্চনসদৃশ সুন্দর এবং কোমল শরীরে ব্যথা লাগে, এই জন্য তিনি নিজে তাঁহাকে কোলে করিয়া বসিতেন। সংক্ষেপতঃ দেবানন্দের প্রেম ভক্তির কথা আর কি বলিব? এখন তাঁহার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। সাধুসঙ্গের এইরূপই আশ্চর্য্য প্রভাব বটে! এ জন্য শাস্ত্রে বলিয়াছেন যে, সহস্র বৎসর যোগ তপস্যা করিলে যাহা লাভ না হয়, একবার সাধুসঙ্গ হইলে তাহা অনায়াসেই লাভ হইয়া থাকে। তাহা হইবারই কথা, কারণ সাধুদিগের শরীর হইতে নিয়ত যে সাধুভাব বিনির্গত হইয়া থাকে, তাহা দ্বারা, তাঁহাদের নিকটে যে সকল ব্যক্তি থাকে, তাহাদের মহৎ ইষ্ট সংসাধিত হয়। তাহাদের ইচ্ছা না থাকিলেও কেমন আপনা আপনি ঐ সাধুভাব তাহাদের মনে প্রবিষ্ট হয়। সাধুগণের মহিমাই এই যে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও পাষণ্ডীদিগের নীরস হৃদয়ক্ষেত্রে ভক্তিবীজ অঙ্কুরিত করিয়া দেন। রোগী যেমন ঔষধ খাইতে অনিচ্ছুক হইলেও হিতাকাঙ্ক্ষী চিকিৎসক তাহাকে ঔষধ সেবন করাইয়া রোগমুক্ত করিয়া থাকেন, সেইরূপ সাধুগণ ভবরোগাক্রান্ত জীবকে কৃপা করিয়া কৃষ্ণভক্তি-মহৌষধ প্রদান করত তাহাদের ভব-রোগের শান্তি সম্পাদন করিয়া থাকেন এবং ঐ সৌভাগ্যবান্ জীব অনায়াসে ভবসমুদ্র পার হইয়া সদ্গতি-লাভে সমর্থ হয়। এই জন্য শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য সাধুসঙ্গকে ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার একমাত্র নৌকা বলিয়া বর্ণিত করিয়াছেন। যথা—

ক্ষণমপি সজ্জনসঙ্গতি-রেকা।
ভবতি ভবার্ণব-তরণে নৌকা॥

দেবানন্দের আলয়ে শ্রীবক্রেশ্বরের অবস্থিতিকালে সেই সঙ্গগুণে ও তাঁহার সেবার ফলে দেবানন্দের যে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, তাহা অতি সুন্দর ও বিশদরূপে শ্রীপাদ দাস গোস্বামী শ্রীচৈতন্যভাগবতে বর্ণন করিয়াছেন। যথা—

দৈবে দেবানন্দ পণ্ডিতের ভক্তিবশে।
রহিলেন তাঁহার আশ্রমে প্রেমরসে॥
দেখিয়া তাঁহার তেজঃপুঞ্জ কলেবর।
ত্রিভুবনে অতুলিত বিষ্ণুভক্তিধর।
দেবানন্দ পণ্ডিত পরম সুখী মনে।
অকৈতব প্রেমে তানে করেন সেবনে॥
বক্রেশ্বর পণ্ডিত নাচেন যতক্ষণ।
বেত্র হস্তে আপনে বুলেন ততক্ষণ॥
আপনি করেন সব লোক এক ভিতে।
পড়িলা আপনে ধরি রাখেন কোলেতে॥
তাঁহার অঙ্গের ধূলা বড় ভক্তি-মনে।
আপনার সর্ব্ব অঙ্গে করেন লেপনে॥
তাঁর সঙ্গে থাকি তান দেখিয়া প্রকাশ।
তখনে জন্মিল প্রভু চৈতন্যে বিশ্বাস॥
বৈষ্ণব সেবার ফল কহে যে পুরাণে।
তার সাক্ষী এই সবে দেখ বিদ্যমানে॥
আজন্ম ধার্ম্মিক উদাসীন জ্ঞানবান।
ভাগবত অধ্যাপনা বিনা নাহি আন॥

শান্ত দান্ত জিতেন্দ্রিয় নির্লোভ বিষয়।
প্রায় আর কতেক বা গুণ তানে হয়॥
তথাপিও গৌরচন্দ্রে নহিল বিশ্বাস।
বক্রেশ্বর প্রসাদে সে কুবুদ্ধি বিনাশ॥
কৃষ্ণসেবা হৈতে বৈষ্ণবের সেবা বড়।
ভাগবত আদি সব শাস্ত্রে কৈল দড়॥
এতেকে বৈষ্ণবসেবা পরম উপায়।
ভক্তসেবা হৈতে সে সবাই কৃষ্ণ পায়॥

শ্রীমদ্ বক্রেশ্বর পণ্ডিতের কৃপাবলেই দেবানন্দ পণ্ডিত শ্রীচৈতন্যভক্ত পরম বৈষ্ণবচূড়ামণি হইয়াছিলেন এবং পরে তিনি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের শ্রীচরণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কি করিয়া তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের কৃপাপাত্র হইয়া একজন শক্তিধর ভক্ত মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন, দেবানন্দ-উপাখ্যানের সেই শেষ অংশটী পরে লিখিত হইবে। এক্ষণে কেবল আর একটী কথা এস্থলে বক্তব্য যে, সম্ভবতঃ যে সময়ে তাঁহার বাটীতে বক্রেশ্বর আসিয়া কিছু দিন বাস করেন, ঐ সময়ে দেবানন্দ শ্রীপণ্ডিত বক্রেশ্বর প্রভুর নিকট কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া তাঁহার শিষ্য বলিয়া পরিগণিত হয়েন।

ইতিপূর্ব্বে চারিজন উদাসীন ভক্ত লইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সন্ন্যাসবেশে নীলাচলে যাত্রা করিবার কথা বলা হইয়াছে। প্রভু এইরূপে ভক্তগণকে পরিত্যাগ করিয়া যখন চলিয়া গেলেন, তখন নবদ্বীপবাসী ভক্তগণ প্রভুশূন্য নদীয়ায় যে, কিপ্রকার অবস্থায় কাল কাটাইতে লাগিলেন, তাহা বর্ণনাতীত। যাঁহারা এক মুহূর্ত্ত কাল প্রভুর অদর্শনে অস্থির হইয়া পড়িতেন, তাঁহারা

কি এরূপ প্রভুবিচ্ছেদ-যাতনা সহ্য করিতে পারেন? তাঁহাদের প্রভুর প্রতি যে অকৈতব প্রেম, তাহাতে বিচ্ছেদ অতীব যন্ত্রণা-প্রদ হইয়া উঠিয়াছিল। কারণ, প্রেমের লক্ষণই এই। প্রাকৃত প্রেম সম্বন্ধেই যখন এই সংসারে যে যাহাকে যত অধিক ভালবাসে, তাহার অদর্শনে তাহার মন ততই অধিক আকুল হয়, তখন অপ্রাকৃত ভগবৎপ্রেম সম্বন্ধে যে নদেবাসী ভক্তগণের প্রভুবিরহ-জ্বালা অসহ্য হইবে, তার আর কথা কি? প্রকৃত ভালবাসাই যে, "আমি তোমারই, আমি তোমা ভিন্ন অল্পকালও থাকিতে পারি না।" প্রকৃত পতিব্রতা সাধ্বী স্ত্রীর নিজ প্রিয়-তমের প্রতি এইরূপই অনুরাগ এবং তিনি যেমন স্বামীর অদর্শনে পলকে প্রলয় জ্ঞান করেন, প্রভুর ভক্তগণেরও প্রভুর প্রতি যেরূপ প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল, তাহাতে তাঁহারাও প্রভুর নীলাচলে গমনের পর সেইরূপ পলকে প্রলয় জ্ঞান করিতে লাগিলেন। যখন প্রভু নবদ্বীপে তাঁহাদের নিকটে ছিলেন, তখন প্রভুর দর্শন, স্পর্শন ও সঙ্গ ভক্তগণের প্রতি বড়ই মধুর বোধ হইত এবং ঠিক দিগদর্শন যন্ত্রের লৌহসূচিকাটী যেমন নানা দিকে ঘুরাইলেও উত্তরদিক্ ভিন্ন আর কোন দিকে যায় না, তাঁহাদের মনও তেমনি নানাপ্রকার বিষয়ব্যাপারের মধ্যে আত্মীয় জনগণের মায়া মমতা অতিক্রম করিয়া সর্ব্বদাই প্রভুর প্রতিই নিরত ছিল। এখন সেই প্রিয়জন প্রভু দৃষ্টির অগোচর এবং স্থানান্তরিত; ভক্তগণের শরীরের ও মনের বল হ্রাস পাইয়া যাইতেছে—প্রভু যেন মন প্রাণ সমস্ত হরণ করিয়া লইয়া চলিয়া গিয়াছেন—তাঁহাদের মনের উদ্যম, উৎসাহাদি সকল বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে—দেহ নিস্তেজ; মন শান্তিশূন্য। বক্রেশ্বর প্রভৃতি প্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্তগণ এইরূপে যেন একপ্রকার মৃতপ্রায়

অবস্থায় কাল কাটাইতেছিলেন। তাঁহারা যে জীবনধারণ করিয়াছিলেন, তাহা কেবল প্রভুর আশ্বাসবাক্যে।

শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করিলে ব্রজগোপীগণের যেরূপ অবস্থা হইয়াছিল, প্রভু নীলাচলে গমন করিলে পর ঠিক সেইরূপ বক্রেশ্বরাদি ভক্তগণও—যাঁহারা ব্রজগোপীগণেরই প্রকাশ ছিলেন—সেইরূপ অবস্থায় দিনাতিপাত করিতেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যেমন গোপীদিগকে পুনর্মিলনের আশা দিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া সেই আশায় তাঁহারা প্রাণ ধারণ করিয়াছিলেন, শ্রীগৌরসুন্দরও সেইরূপ যাইবার সময়ে ভক্তগণকে আশা দিয়া গিয়াছেন বলিয়া ইঁহারাও ঐ আশ্বাসবাক্যে জীবন ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, "কখনও বা তোমরা নীলাচলে গমন করিবে, কখনও বা আমি গঙ্গাস্নান উপলক্ষে তোমাদের এখানে আসিব"।

ভক্তগণ যখন গৌরশূন্য নদীয়ায় আর তিষ্ঠিতে পারিলেন না, তখন প্রভু যে বলিয়া গিয়াছেন "আমি কখনও গঙ্গাস্নান উপলক্ষে আসিব," সে আগমন আর প্রতীক্ষা না করিয়া, প্রভুর প্রথম আদেশ যে "তোমরা কখনও বা নীলাচলে যাইবে," তাহাই পালনীয় মনে করিয়া, শ্রীগৌরচন্দ্রকে দর্শন করিবার জন্য নীলাচলে যাইবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন। কিন্তু যখন শুনিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র নীলাচল হইতে দক্ষিণ দেশে গমন করিয়াছেন, তখন আর কি করেন, অগত্যা ক্লেশ সহ্য করিয়া রহিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব গৌড়দেশ হইতে সন্ন্যাস পরিগ্রহ করিয়া নীলাচলে গমন পূর্ব্বক কিছু দিন তথায় অবস্থিতি করিবার পরই দক্ষিণ দেশসমূহে তীর্থ সকল দর্শন মানসে এবং প্রধানতঃ তদ্দেশবাসী জনগণকে প্রেমবন্যা-স্রোতে ভাসা-

ইয়া তাঁহাদের কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ করত উদ্ধার করিবার উদ্দেশে, দক্ষিণাঞ্চলে গমন করিয়াছিলেন, এবং আপনার অগ্রজ বিশ্বরূপের অনুসন্ধান করাও তাঁহার একটী উদ্দেশ্য ছিল। দুই বৎসর কাল এইরূপে নানা তীর্থ সকল দর্শন করিয়া পুনর্ব্বার নীলাচলে প্রত্যাগমন করেন। ঐ দুই বৎসর কাল প্রভুর যে অলৌকিক ও অনন্ত লীলাপ্রকাশ, তাহা শ্রীগ্রন্থাবলিতে বর্ণিত আছে এবং অমিয় নিমাইচরিতেও অতি বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেবের নীলাচলে প্রত্যাগমন-সংবাদ নবদ্বীপে প্রেরিত হইলে, যখন নদেবাসী বক্রেশ্বর প্রভৃতি ভক্তগণ তাহা শুনিলেন, তখন আর কি তাঁহারা কালবিলম্ব করিতে পারেন? তাঁহাদের আর আনন্দের সীমা রহিল না। নীলাচলে যাইয়া শ্রীগৌরসুন্দরকে দেখিবার জন্য একেবারেই যুক্তি পরামর্শ স্থির হইতে লাগিল। মহাপ্রভুর অভাবে এখন শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যই প্রধান ও সকল ভক্তগণের কর্ত্তা স্বরূপ ছিলেন। ভক্তগণ শান্তিপুরে আচার্য্যের আলয়ে গমন করিয়া মনের অভিলাষ তাঁহাকে অবগত করিবার জন্য চলিলেন। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

হরিদাস ঠাকুরের হৈল পরম আনন্দ।
বাসুদেব দত্ত গুপ্ত মুরারি শিবানন্দ॥
আচার্য্যরত্ন আর পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
আচার্য্যনিধি আর পণ্ডিত গদাধর॥
শ্রীরাম পণ্ডিত আর পণ্ডিত দামোদর।
শ্রীমান পণ্ডিত আর বিজয় শ্রীধর॥
রাঘব পণ্ডিত আর আচার্য্য নন্দন।
কতেক কহিব আর যত প্রভুর গণ॥

শুনিয়া সবার হৈল পরম উল্লাস।
সবে মিলি আইলা শ্রীঅদ্বৈতের পাশ॥

শ্রীঅদ্বৈতের আলয়ে ভক্তগণ আগমন করিলে, আচার্য্য তাঁহাদের অতি যত্নের সহিত রাখিলেন ও কয়েক দিন সেখানে মহোৎসবও হইল। যথা—

দুই তিন দিন আচার্য্য মহোৎসব কৈল।
নীলাচল যাইতে তবে যুক্তি দৃঢ় হৈল॥

শান্তিপুরে যুক্তি পরামর্শ স্থির হইয়া গেল যে, প্রভুকে দেখিতে নীলাচলে যাওয়াই কর্ত্তব্য। ভক্তগণের আর আনন্দ ধরে না। তখন শ্রীঅদ্বৈত সকল ভক্তগণকে লইয়া শচীমাতার অনুমতি ও বিদায় গ্রহণ করিবার জন্য নবদ্বীপে প্রভুর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এবং তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া নীলাচলে যাত্রা করিলেন। যথা—শ্রীচৈতন্যভাগবতে—

অনন্ত চৈতন্যভক্ত কত জানি নাম।
চলিলেন সবে হই আনন্দের ধাম॥
আই স্থানে ভক্তি করি বিদায় হইয়া।
চলিলা অদ্বৈত সিংহ ভক্ত গোষ্ঠী লৈয়া॥

তথাহি—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

সবে মিলি নবদ্বীপে একত্র হইঞা।
নীলাদ্রি চলিল শচীমাতার আজ্ঞা লঞা॥

যাইবার সময় শ্রীবক্রেশ্বরের আর আনন্দ দেখে কে? যদিও তাঁহার নৃত্যোপযোগী কীর্ত্তনিয়া শ্রীগৌরসুন্দর উপস্থিত

নাই, তথাচ সেই কীর্ত্তনিয়াকে দর্শন করিতে যাইতেছেন, এই উল্লাসেই তিনি পথে নৃত্য করিতে করিতে চলিলেন। তাঁহার আনন্দ উপস্থিত হইলেই আপনা আপনি নৃত্য আসিয়া পড়িত। নৃত্যক্রিয়াটীই তীব্র আহ্লাদের একটী লক্ষণ।

চলিলেন হরিষে পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
যে নাচিতে কীর্ত্তনিয়া শ্রীগৌরসুন্দর ॥

ভক্তগণ তো নীলাচলে আসিয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন। বিচ্ছেদের পর প্রিয়বস্তুর সহিত পুনর্মিলন হইলে যেরূপ হইয়া থাকে, সেইরূপ প্রভুর সহিত পুনর্মিলনে ভক্তগণের যেন আবার কোথা হইতে উদ্যম, উৎসাহ পুনরুজ্জীবিত হইয়া তাঁহাদের নিস্তেজ দেহে শক্তি ও ভগ্ন মনে শান্তি সঞ্চার করিয়া দিল এবং আবার নবানুরাগে মাতিয়া তাঁহারা প্রাণবল্লভ প্রভুর সঙ্গসুখ উপভোগ করিতে লাগিলেন। নদেবাসী ভক্তগণের মধ্যে গৃহীর সংখ্যাই অধিক—তাঁহারা স্ত্রীপুত্রাদি পরিবার বাটীতে রাখিয়া আসিয়াছেন। যদিও প্রভুকে ছাড়িয়া নদীয়ায় ফিরিয়া যাইতে তাঁহাদের মন চাহিত না বটে, তবু তাঁহারা জানিতেন যে প্রভু তাঁহাদের সংসার পরিত্যাগ করিয়া চিরদিনের জন্য নিকটে থাকিতে অনুমতি দিবেন না—এই জন্য তাঁহারা আসিবার সময় কয়েক মাসের জন্যই বাটী হইতে বিদায় লইয়া আসিয়াছিলেন; কিন্তু উদাসীন ভক্তগণ আর গৌরশূন্য গৌড়ে ফিরিবেন না, প্রভুর সঙ্গে থাকিয়া চিরকাল প্রভুর সেবা করিবেন, ইহাই সঙ্কল্প করিয়া আসিয়াছিলেন এবং বাস্তবিকই তাঁহারা আর ফিরিলেন না; নীলাচলে প্রভুর নিত্যসঙ্গী হইয়া রহিয়া গেলেন। ঐ সকল উদাসীন মর্ম্মী ভক্তগণ মধ্যে শ্রীবক্রে-

শ্বর পণ্ডিত একজন প্রধান ছিলেন। তাঁহাদের নাম শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে লিখিত হইয়াছে। যথা—

পরমানন্দপুরী আর স্বরূপ দামোদর।
গদাধর জগদানন্দ শঙ্কর বক্রেশ্বর॥
দামোদর পণ্ডিত ঠাকুর হরিদাস।
রঘুনাথ বৈদ্য আর রঘুনাথ দাস॥
ইত্যাদিক পূর্ব্বসঙ্গী বড় ভক্তগণ।
নীলাচলে রহি করে প্রভুর সেবন॥

এই সকল বন্দনীয় প্রভুর পারিষদগণের মধ্যে শ্রীমৎ বক্রেশ্বর পণ্ডিতকে একজন প্রধান এই জন্য বলিলাম যে, তিনি প্রভুর সহিত প্রভুর নিজের আশ্রমেই বাস করিতেন।

আমরা এ পর্য্যন্ত, প্রভু নীলাচলে যে স্থানে অবস্থিতি করিতেন, তাহার কোন উল্লেখ করি নাই; এক্ষণে তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ বর্ণন করা প্রাসঙ্গিক বিবেচনা করি। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নীলাচলে উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের গুরু কাশীমিশ্রের বাটীতেই থাকিতেন। দুই বৎসর কাল ব্যাপিয়া দক্ষিণ দেশ-সমূহে পরিভ্রমণের পর যখন প্রভু নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, সেই সময় হইতেই প্রভুর বাসের জন্য ঐ কাশীমিশ্রের আলয় নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। এবং সেই সময় হইতেই কাশীমিশ্র প্রভুর গণ-মধ্যে ভুক্ত হইয়া, নিজ আলয় প্রভুর আশ্রমের জন্য প্রদান করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। প্রভু দক্ষিণ দেশ হইতে ফিরিয়া আসিলে পর সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য—যিনি উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের সভাপণ্ডিত ছিলেন ও যিনি পূর্ব্বেই প্রভুকে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলেন—তিনিই রাজার নিকট মহাপ্রভুর উপযুক্ত

একটী বাসা স্থির করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করেন। কি-প্রকার স্থান প্রভুর আশ্রমের জন্য উপযুক্ত হইবে, সে সম্বন্ধে ভট্টাচার্য্য রাজাকে বলিলেন, যথা—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

ঠাকুরের নিকট হবে হইবে নির্জনে।
ঐছে নির্ণয় করি দেহ এক স্থানে॥

রাজা শুনিয়া মনে মনে বিচার করিয়া দেখিলেন এবং শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের নিকট নির্জন স্থান—শ্রীকাশীমিশ্রের বাটীই উপযুক্ত স্থান স্থির করিয়া ভট্টাচার্য্যকে কহিলেন, যথা—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

রাজা কহে ঐছে কাশীমিশ্রের সদন।
ঠাকুরের নিকট হয় পরম নির্জন॥

ভট্টাচার্য্য রাজার ঐ কথা শুনিয়া অবিলম্বে কাশীমিশ্রের নিকট গমন করত তাঁহাকে রাজার ঐ অভিপ্রায়ের কথা জানাইলেন। কাশীমিশ্র শুনিবামাত্রেই আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া কহিলেন, ইহা হইতে তাঁহার সৌভাগ্য কি হইবে? তাঁহার ঐ ছার ভবন জগদ্‌গুরু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের আবাসস্থল হইয়া পবিত্র হইবে, ইহাতে তিনি ধন্য হইবেন। মিশ্র কহিলেন, যথা—

কাশীমিশ্র কহে আমি বড় ভাগ্যবান্।
মোর ঘরে প্রভুপাদের হবে অবস্থান॥

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

যখন সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভুকে ঐ কাশীমিশ্রের বাটীতে লইয়া গেলেন, তখন কাশীমিশ্র আসিয়া মহাপ্রভুর চরণপ্রান্তে পতিত হইয়া শরণাগত হইলেন এবং ভক্তবৎসল দয়াল প্রভুও

তাঁহাকে কৃপা করিয়া শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী রূপে দর্শন দিলেন ও আলিঙ্গন করিয়া কৃতার্থ করিলেন, যথা—শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে—

কাশীমিশ্র পড়িলা আসি প্রভুর চরণে।
গৃহ সহিত আত্মা তাঁরে কৈল নিবেদনে॥
প্রভু চতুর্ভুজ মূর্ত্তি তাঁরে দেখাইলা।
আত্মসাৎ করি তাঁরে আলিঙ্গন কৈলা॥

যখন প্রভুর নদেবাসী ভক্তগণ নীলাচলে আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন প্রভু ঐ কাশীমিশ্রের আলয়রূপ আশ্রমে বাস করিতেন। রাজা প্রতাপরুদ্র ভক্তগণের জন্য পৃথক্ পৃথক্ বাসা স্থির করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা দিবা রাত্রির মধ্যে অধিক সময়ই প্রভুর ঐ আশ্রমে কাটাইতেন। গৃহী ভক্তগণ চারি মাস কাল নীলাচলে থাকিয়া মহা আনন্দে প্রভুসঙ্গে কাটাইয়া অবশেষে গৌড়ে পুনরাগমন করিলেন। তাঁহাদের আসিবার সময় বিদায়ের কালে শ্রীগৌরাঙ্গ দেব সকলকে আলিঙ্গন করিলেন ও গৃহে বসিয়া শ্রীকৃষ্ণের ভজন ও সঙ্কীর্ত্তন করিতে বলিয়া, আদেশ করিলেন যে, প্রতি বৎসর যেন তাঁহারা রথ দর্শন করিতে আগমন করেন। যথা—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

গৌড়িয়া ভক্তেরে আজ্ঞা দিলা বিদায়ের দিনে।
প্রত্যব্দ আসিবে রথযাত্রা দরশনে॥

ভক্তগণ তাহাই করিতেন। প্রতি বৎসরই রথযাত্রা উপলক্ষে নীলাচলে আসিয়া প্রভুকে দর্শন করিয়া যাইতেন। যথা—

আর যত ভক্তগণ গৌড়দেশ-বাসী।
প্রত্যব্দ প্রভুরে দেখে নীলাচলে আসি॥

যে চারি মাস কাল নদেবাসী ভক্তগণ নীলাচলে রহিলেন, সেই চারি মাস কাল ভক্তগণের সহিত প্রভু যে কত মধুর লীলা করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনাতীত। সে অনন্ত লীলামাধুরী সাধারণ জনগণের আস্বাদন জন্য গৌরগতপ্রাণ গৌরচন্দ্রের কৃপায় শক্তিমান্ ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় অতি প্রাঞ্জল অথচ তেজস্বিনী ভাষায় তাঁহার অতুল্য গ্রন্থ "অমিয় নিমাই চরিতে" অতি সুন্দররূপে বর্ণন করিয়াছেন। আপামর সাধারণ সকল লোকে প্রভুর লীলাকাহিনী পাঠ করিয়া উদ্ধার হইয়া যাইবে, সেই উদ্দেশেই শ্রীভগবান্ তাঁহাকে এতাদৃশ শক্তিমান্ করিয়াছেন।

আমরা এস্থলে কেবল এই মাত্রই বলিব, গৌড়বাসী ভক্তগণের সহিত মহাপ্রভু প্রতিদিনই শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের আরতির সময়ে শ্রীমন্দির-সম্মুখে অপূর্ব্ব মনোমুগ্ধকর সঙ্কীর্ত্তন করিতেন। সে সঙ্কীর্ত্তন অতুলনীয়। গৌড়ের ভক্তবৃন্দ দেশ হইতেই মৃদঙ্গ, করতাল প্রভৃতি সঙ্গে আনিয়াছিলেন। এই অভিনব মন-মাতান সঙ্কীর্ত্তন দেখিয়া উড়িষ্যাবাসী লোক সকল একেবারে বিমুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল এবং সেই হইতেই উড়িষ্যা দেশে প্রথম সঙ্কীর্ত্তনের সৃষ্টি হয়। ঐ সঙ্কীর্ত্তনের সঙ্গে শ্রীপাদ বক্রেশ্বর পণ্ডিতের একটু বিশেষ সম্বন্ধ ছিল। তিনিই প্রধান নৃত্যকারী। মহাপ্রভু ঐ সময়ে যে চারিটী দল প্রস্তুত করিলেন, তাহাদের মধ্যে এক দলের কর্ত্তা করিলেন শ্রীবক্রেশ্বরকে। আর নিত্যানন্দ, অদ্বৈত ও শ্রীবাস অপর তিনটী দলের কর্ত্তা হইলেন। সাধারণতঃ কীর্ত্তন আরম্ভ হইলে ঐ চারি সম্প্রদায়ের চারিজন কর্ত্তাকে প্রভু নাচিতে বলিতেন। তাঁহারা নাচিতে আরম্ভ করিলে কিঞ্চিৎ পরেই প্রভু আর থাকিতে

পারিতেন না, নিজে অতি নয়ন-রসায়ন ও অতি ভক্তি-উদ্দীপক নৃত্য আরম্ভ করিতেন। মহাপ্রভু যখন নাচিতেন, তখন তিনি এমনি ঘুরিয়া ঘুরিয়া সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে নৃত্য করিতেন যে, সকল সম্প্রদায়ই মনে করিতেন যে, প্রভু কেবল তাঁহাদের সম্প্রদায়েই নৃত্য করিতেছেন। শ্রীভগবানের এই একটী অদ্ভুত লীলা—তিনি সকল ভক্তের প্রিয় এবং সকল ভক্তই মনে করেন যে, তিনিই প্রভুর অতিশয় প্রিয়পাত্র। যেমন শ্রীবৃন্দাবনলীলায় রাসোৎসবের কালে গোপিকারা সকলেই মনে করিয়াছিলেন যে, প্রাণনাথ কৃষ্ণ আমারই কাছে আছেন, সেইরূপ নীলাচলে কলিযুগাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ঐ সঙ্কীর্ত্তনলীলায় ভক্তগণ তদ্রূপই ভাবিতেন যে, প্রভু মৎসন্নিধানেই রহিয়াছেন। প্রভু ভাবে বিভোর হইয়া যখন নৃত্য করিতেন, তখন মধ্যে মধ্যে বক্রেশ্বরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করত তাঁহার মুখচুম্বন করিতেন। এই বিষয়ে শ্রীঅমিয় নিমাই চরিত গ্রন্থে "চৈতন্য চরিত" কাব্য হইতে দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। প্রথম শ্লোকটীর অর্থ যথা—

"শ্রীযুত গৌরচন্দ্র সহর্ষে কখন বক্রেশ্বরকে আলিঙ্গন করিয়া চুম্বন করিতেছেন, কখনও বা সুমধুর পাদপদ্মদ্বয় ভূতলে শীঘ্র শীঘ্র বিন্যাস করত শোভা পাইতেছেন।"

দ্বিতীয় শ্লোকটীর অর্থ যথা—

"গৌরাঙ্গ কখন মুহুর্মুহুঃ বিবিধ বিলাস বিস্তার করত পুনঃ পুনঃ সেই বক্রেশ্বরকে আলিঙ্গন করিতেছেন এবং সুমধুর হাস্য-রুচিতে দিঙ্মণ্ডল উদ্দীপ্ত করিয়া লঘু লঘু সুমধুর অস্ফুট স্বরে গান গাইতেছেন।"

বক্রেশ্বরের নৃত্য দেখিয়া প্রভু তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াই

তাঁহাকে ঐরূপ গাঢ় আলিঙ্গন করিতেন এবং তাঁহার নৃত্যের সমকক্ষ গায়ক নাকি আর কেহ ছিল না ও তিনি নিজে গান না গাহিলে নাকি বক্রেশ্বরের নৃত্যসুখ হইত না, এই জন্যই প্রভু নিজে গান ধরিতেন এবং বক্রেশ্বর তাহাতে আরও দ্বিগুণতর উৎসাহে নাচিতেন।

আজ কাল যাঁহারা মার্জ্জিত রুচির লোক বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহারা হয় তো এইরূপ মহাপ্রভুর বক্রেশ্বরকে আলিঙ্গন ও চুম্বনের কথা শুনিয়াই ভ্রূকুটী ও নাসিকাকুঞ্চন করিয়া উঠিবেন এবং তাঁহারা সে সময় ঐ সঙ্কীর্ত্তনক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিলে পুরুষে পুরুষে এরূপ আলিঙ্গন ও চুম্বনও এত লোকের চক্ষের সম্মুখে দেখিতে মহা কুরুচির কার্য্য বিবে- বিবেচনা করিয়া "অতিশয় অশ্লীল, অতিশয় অশ্লীল" বলিতে বলিতে সে স্থান হইতে বেগে প্রস্থান করিতেন। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় যে, সে সময় পাশ্চাত্য জ্ঞানালোক এদেশে আসিয়া উদয় হয় নাই। তখন যাঁহারা ঐরূপ চুম্বনালিঙ্গন দর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাদের মনে কোনরূপ অস্বাভাবিক ভাবের উদয় হওয়া দূরে থাকুক, বরং তাঁহারা উহা দেখিয়া একেবারে বিমুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন এবং উহা দর্শন করিয়া শ্রীজগন্নাথ দেবের সেবক যত উড়িষ্যাবাসিগণের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম উথলিয়া উঠিয়াছিল এবং তাঁহারাও আনন্দে বিহ্বল হইয়া "জয় জগন্নাথ, জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য" বলিয়া নাচিতে লাগিলেন। শ্রীযুক্ত শিশির বাবু লিখিয়াছেন—"তাই শাস্ত্রে বলেন, গোপীপ্রেমে কাম-গন্ধ নাই অর্থাৎ হৃদ্‌রোগ কি কামরোগ থাকিতে কৃষ্ণপ্রেম উদয় হয় না, অথবা কৃষ্ণপ্রেম উদয় হইলে হৃদ্‌রোগ কি কামরোগ বশীভূত হয়। শ্রীকৃষ্ণপ্রেম উদয় হইলে স্ত্রী ও পুরুষ

ভেদজ্ঞান লোপ হয়, অথচ স্ত্রী ও পুরুষে যে মধুর প্রেম উহা পরিবর্দ্ধিত হয়। এক শ্রীভগবান্ পুরুষ, আর সমুদয় প্রকৃতি; পরিণামে জীব মাত্র গোপ গোপীরূপে শ্রীভগবানের সহিত মিলিত হইবে। শ্রীগৌরাঙ্গের বক্রেশ্বরকে চুম্বন দ্বারা শ্রীভগবানের জীবের সহিত, জীবের জীবের সহিত ও জীবের শ্রীভগবানের সহিত কত গাঢ় সম্বন্ধ, কতক অনুভব করা যাইতে পারে। যাঁহারা পরকীয় প্রেমের কথা শুনিলে ক্লেশ পায়েন, তাঁহারা দেখিবেন যে, এই প্রেমে স্ত্রী পুরুষ জ্ঞান নাই।"

ঐ মর্ম্মী ভক্তগণের গলা ধরিয়া তাঁহাদের মুখচুম্বন সম্বন্ধে শিশির বাবু আরও বলেন যে—"যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গকে ভগবান্ বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহারা তাঁহার এই ভক্তগণকে প্রেমে চুম্বন দ্বারা বুঝিতে পারিবেন যে, শ্রীভগবানের তাঁহার জীবের প্রতি কত ভালবাসা। যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গকে ভগবান্ পর্য্যন্ত বিশ্বাস না করিয়া কেবল ভক্তচূড়ামণি ভাবেন, তাঁহারাও বুঝিবেন যে, শ্রীভগবানের হৃদয়ে কত প্রেম আছে। যেহেতু ভক্তগণ শ্রীভগবানের বিন্দুমাত্র প্রেম পাইয়া থাকেন।"

যে চারি মাস কাল প্রভুর নবদ্বীপবাসী ভক্তগণ নীলাচলে ছিলেন, তাহারই মধ্যে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসব উপস্থিত হইল। ঐ রথযাত্রা উপলক্ষে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে যেরূপ উৎসব হইত, এইবার মহাপ্রভুর কৃপায় তদপেক্ষা উৎসব শত গুণে লোকের হৃদয়রঞ্জন হইয়াছিল। রথের সম্মুখে প্রভু যে "বেড়া সঙ্কীর্ত্তন" সৃষ্টি করিলেন, এরূপ অদ্ভুত উৎসব আর কখনও কাহারও নয়নগোচর হয় নাই। ঐ সঙ্কীর্ত্তনে প্রভু ভক্তগণকে একত্র করিয়া ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে ভাগ করিয়া দিলেন। ঐ অপূর্ব্ব সঙ্কীর্ত্তন-মধ্যেই বক্রেশ্বর নাচিতে

নাচিতে প্রভুর চরণ ধরিয়া বলিয়াছিলেন "হে চন্দ্রমুখ, দশ সহস্র গন্ধর্ব্ব আমার নৃত্যের সহিত গান করিতে নিযুক্ত করুন, তবে আমার নৃত্যসুখ হয়"। ঐ সঙ্কীর্ত্তনের সম্প্রদায়বিভাগ যেরূপ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত আছে, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল, যথা—

চারি সম্প্রদায় কৈল চব্বিশ গায়ন।
দুই দুই মার্দঙ্গিক হইল অষ্ট জন॥
তবে মহাপ্রভু মনে বিচার করিঞা।
চারি সম্প্রদায় কৈল গায়ন বাটিঞা॥
নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, হরিদাস, বক্রেশ্বরে।
চারিজনে আজ্ঞা দিল নৃত্য করিবারে॥
প্রথম সম্প্রদায় কৈল স্বরূপ-প্রধান।
আর পঞ্চজন দিল তার পালিগান॥
দামোদর নারায়ণ দত্ত গোবিন্দ।
রাঘব পণ্ডিত আর শ্রীগোবিন্দানন্দ॥
অদ্বৈত আচার্য্য তাঁহা নৃত্য করিতে দিল।
শ্রীবাস-প্রধান আর সম্প্রদায় কৈল॥
গঙ্গাদাস হরিদাস শ্রীমান শুভানন্দ।
শ্রীরাম পণ্ডিত তাঁহা নাচে নিত্যানন্দ॥
বাসুদেব গোপীনাথ মুরারি যাঁহা গায়।
মুকুন্দ-প্রধান কৈল আর সম্প্রদায়॥
শ্রীকান্ত বল্লভ সেন আর দুই জন।
হরিদাস ঠাকুর তাঁহা করেন নর্ত্তন॥

গোবিন্দ ঘোষ-প্রধান কৈল আর সম্প্রদায়।
হরিদাস বিষ্ণুদাস রাঘব যাঁহা গায়॥
মাধব বাসুদেব আর দুই সহোদর।
নৃত্য করেন তাঁহা পণ্ডিত বক্রেশ্বর॥
কুলীন গ্রামের এক কীর্ত্তনিয়া সমাজ।
তাঁহা নৃত্য করে রামানন্দ সত্যরাজ॥
শান্তিপুর আচার্য্যের এক সম্প্রদায়।
অচ্যুতানন্দ নাচে তাঁহা আর সব গায়॥
খণ্ডের সম্প্রদায় করে অন্যত্র কীর্ত্তন।
নরহরি নাচে তাঁহা শ্রীরঘুনন্দন॥
জগন্নাথ আগে চারি সম্প্রদায় গায়।
দুই পার্শ্বে দুই, পাছে এক সম্প্রদায়॥
সাত সম্প্রদায়ে বাজে চৌদ্দ মাদল।
যার ধ্বনি শুনি বৈষ্ণব হৈল পাগল॥
এই তো কহিল প্রভুর মহা সংকীর্ত্তন।
জগন্নাথের আগে যৈছে করিলা নর্ত্তন॥
ইহা যেই শুনে সেই গৌরচন্দ্র পায়।
সুদৃঢ় বিশ্বাস সহ প্রেমভক্ত হয়॥

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রভুর গৌড়বাসী গৃহী ভক্তগণ প্রতিবৎসর রথযাত্রার সময় প্রভুকে দর্শন করিতে আসিতে লাগিলেন। একবার তাঁহারা বিদায় লইয়া চলিয়া গেলে পর, শ্রীগৌরাঙ্গদেব কিছু দিনের জন্য নীলাচল পরিত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে যাইবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। সে সময় নীলাচল

হইতে শ্রীবৃন্দাবন যাইতে হইলে ঝাড়খণ্ডের মধ্যগত জঙ্গল-পথেই গমন করিতে হইত, কিন্তু প্রভু সে পথে না গিয়া ঐ একই উপলক্ষে গৌড়দেশে স্নেহময়ী জননীকে দেখিবেন বলিয়া গৌড়দেশ হইয়াই যাওয়া স্থির করত, বিজয়া-দশমী-দিবসে নীলাচল হইতে যাত্রা করিলেন। ভক্তগণের মধ্যে কতকগুলি উদাসীন ভক্তকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন, এবং গৌড়দেশবাসী ও উড়িষ্যাবাসী আর সকল ভক্তবৃন্দকে বুঝাইয়া নীলাচলে রাখিয়া গেলেন। তাঁহার নিয়তসঙ্গী শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতও প্রভুর সঙ্গে গিয়াছিলেন। যাঁহারা সঙ্গে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত আছে। যথা—

প্রভু সঙ্গে পুরী গোসাঞি স্বরূপ দামোদর।
জগদানন্দ মুকুন্দ গোবিন্দ কাশীশ্বর॥
হরিদাস ঠাকুর আর পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
গোপীনাথাচার্য্য আর পণ্ডিত দামোদর॥
রামাই নন্দাই আর বহু ভক্তগণ।
প্রধান কহিল সবার কে করে গণন॥

প্রভু গৌড়ে আসিয়া কতকদিন কুমারহট্টে অর্থাৎ হালিসহর গ্রামে বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে আসিয়া রহিলেন। প্রভু আসিয়াছেন শুনিয়া গৌড়বাসী ভক্তগণ যার পর নাই পুলকিত হইলেন এবং দলে দলে প্রভুকে দর্শন করিতে আসিতে লাগিলেন। যে চারি পাঁচ দিন প্রভু বিদ্যাবাচস্পতির বাটীতে, অবস্থিতি করিয়াছিলেন, সে কয়দিন আর লোকের ভিড়ের বিরাম ছিল না। শেষে লোকসংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল যে, প্রভু একদিন রাত্রে গোপনে বক্রেশ্বর প্রভৃতি কতিপয় শিষ্যগণ

সঙ্গে কুমারহট্ট পরিত্যাগ করিয়া কুলিয়া গ্রামে প্রস্থান করিলেন। যথা—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

আসি বিদ্যাবাচস্পতি-গৃহেতে রহিলা।
প্রভুরে দেখিতে লোক-সঙ্ঘট্ট হইলা॥
পঞ্চ দিন দেখে লোক নাহিক বিশ্রাম।
লোকভয়ে রাত্রে প্রভু আইলা কুলিয়া গ্রাম॥

এই কুলিয়া গ্রাম নবদ্বীপের অদূরবর্ত্তী। এখানে শ্রীমাধব দাসের বাটীতে প্রভু অবস্থিতি করিলেন। কিন্তু এখানে আসিয়াও কি নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন? এখানেও সহস্র সহস্র লোক আসিতে আরম্ভ করিল। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

কুলিয়া গ্রামেতে প্রভুর শুনি আগমন।
কোটি কোটি লোক আসি কৈলা দরশন॥

এইরূপ হইবারই তো কথা। প্রভুই কি তাহা বুঝিতে পারিতেন না যে, যেখানে তিনি থাকিবেন, ভক্তগণ আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার চরণসমীপে আসিবেই আসিবে। চুম্বক পাথর যেমন লৌহকে আকর্ষণ করিয়া থাকে, আমাদের শ্রীগৌরাঙ্গ-পরশমণি তেমনি ভক্তগণের মনকে আকর্ষণ করিবেনই। এই কুলিয়ায় লোকের যে জনতা হইল, তাহা বর্ণনাতীত। যথা—

কুলিয়ার আকর্ষণ না যায় কথন।
কেবল বর্ণিতে শক্তি সহস্রবদন॥

শ্রীচৈতন্যভাগবত।

এই কুলিয়া গ্রামে মহাপ্রভু কত যে লীলা প্রকাশ করিলেন সে সকলের মধ্যে একটী বিষয় এস্থলে বর্ণন করা আবশ্যক।

যে হেতু তাহার সহিত আমাদের শ্রীপণ্ডিত প্রভু বক্রেশ্বরের সম্বন্ধ রহিয়াছে।

দেবানন্দ-উপাখ্যান

(শেষাংশ)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর কুলিয়া গ্রামে অবস্থিতি-সময়ে লীলাকীর্ত্তি-কলাপের মধ্যে, লিখিত আছে। যথা—

কুলিয়া গ্রামেতে কৈল দেবানন্দেরে প্রসাদ।

এই ঘটনাটী কি, তাহাই একটু বিস্তৃতরূপে এই স্থলে বর্ণনা করা যাইতেছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, শ্রীমৎবক্রেশ্বর-প্রসাদে দেবানন্দ পণ্ডিতের মনে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রতি বিশ্বাস জন্মিয়াছিল এবং তদ্দ্বারাই তাঁহার শ্রীগৌরাঙ্গ-পদপ্রাপ্তির সোপান হইয়াছিল। শ্রীবক্রেশ্বরের প্রিয়শিষ্য দেবানন্দের প্রতি বিশেষ কৃপাদৃষ্টি ছিল এবং মহাপ্রভুর কুলিয়ায় অবস্থিতি-সময়ে একদা তিনি দেবানন্দের বাটীতে গমন করিলেন। অবশ্য দেবানন্দের যে শ্রীচৈতন্যের চরণ-দর্শন-লালসা অতিশয় তীব্র হইয়াছিল এবং ঐ অভিলাষ পূর্ণ না হওয়ায় তিনি যে অতি উৎকণ্ঠিত মনে কাল কাটাইতেছিলেন, তাহা আর পণ্ডিত প্রভু বক্রেশ্বরের বুঝিতে বাকি ছিল না। তিনি তাঁহার প্রিয়শিষ্যের উদ্ধারার্থ, প্রেমপুলকে নৃত্য করিতে করিতে দেবানন্দকে আলিঙ্গন করিয়া শ্রীচৈতন্য-সমীপে উপস্থিত হইলেন। দেবানন্দ প্রভুর শ্রীচরণসমীপে, সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া শতশত-অপরাধীর মত এক প্রান্তে কৃতাঞ্জলিপুটে রহিলেন। তখন তাঁহার মনে, শ্রীবাসের যে অপমান তাঁহার টোলে ঘটিয়াছিল সেই কথা, ও মহাপ্রভু যে

নবদ্বীপের পথে তজ্জন্য তাঁহাকে তিরস্কার ও ভৎর্সনা করিয়াছিলেন সেই কথা, যুগপৎ উদিত হওয়ায় তাঁহাকে ব্যাকুলিতচিত্ত করিল; প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবার ক্ষমতা তাঁহার রহিল না—নীরব হইয়া প্রভুর চরণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই রহিলেন। কিন্তু দয়াময় প্রভু নাকি সাক্ষাৎ ক্ষমার অবতার, আর সাধুসঙ্গপ্রভাবে নাকি তাঁহার ভগবানের চরণ প্রাপ্তির সময় উপস্থিত হইয়াছে, তাই অন্তর্যামী প্রভু তাঁহার মন বুঝিয়া সহাস্যবদনে দেবানন্দকে আহ্বান করিয়া, নির্জনে তাঁহাকে জ্ঞান-উপদেশ প্রদান করত, তাঁহার পূর্ব্ব অপরাধ সমস্ত মার্জ্জনা করিয়া তাঁহাকে চরিতার্থ করিলেন। যথা—শ্রীচৈতন্যভাগবতে—

বক্রেশ্বর পণ্ডিতের সঙ্গের প্রভাবে।
গৌরচন্দ্র দেখিতে চলিলা অনুরাগে॥
বসিয়া আছেন গৌরচন্দ্র ভগবান।
দেবানন্দ পণ্ডিত হইলা বিদ্যমান॥
দণ্ডবৎ দেবানন্দ পণ্ডিত করিয়া।
রহিলেন এক দিকে সঙ্কুচিত হৈয়া॥
প্রভুও তাহাকে দেখি সন্তোষিত হৈলা।
বিরল হইয়া তানে লইয়া বসিলা॥
পূর্ব্বে তার যত কিছু ছিল অপরাধ।
সকল ক্ষমিয়া প্রভু করিলা প্রসাদ॥

ধন্য ধন্য দেবানন্দ!! আর ধন্য প্রভু বক্রেশ্বর! ধন্য তোমার সঙ্গমহিমা!! যে স্থানে প্রভু দেবানন্দকে ঐরূপ কৃতার্থ করেন, সেই স্থান "অপরাধভঞ্জনের পাট" বলিয়া বৈষ্ণবদিগের একটী

প্রধান তীর্থরূপে বিখ্যাত; এবং অদ্যাবধি বক্রেশ্বরের অপূর্ব্ব মহিমা কীর্ত্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে।

প্রভু বিরলে লইয়া দেবানন্দকে যে নানাবিধ জ্ঞান-উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে বক্রেশ্বর সম্বন্ধে যে যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহাতেই বক্রেশ্বরের কত বড় মাহাত্ম্য, তাহা প্রভুর নিজ উক্তিতে প্রকাশ পাইতেছে। যথা—

প্রভু বলে তুমি যে সেবিলা বক্রেশ্বর।
অতএব হৈলা তুমি আমার গোচর॥
বক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রভুর পূর্ণশক্তি।
সেই কৃষ্ণ পায় যে তাঁহাকে করে ভক্তি॥
বক্রেশ্বর-হৃদয়ে কৃষ্ণের নিজ ঘর।
কৃষ্ণ নৃত্য করেন নাচিলে বক্রেশ্বর॥
যে তে স্থানে যদি বক্রেশ্বর সঙ্গ হয়।
সেই স্থান সর্ব্বতীর্থ শ্রীবৈকুণ্ঠময়॥

দেবানন্দ এখন ভক্তিপূর্ণহৃদয় হইয়াছিলেন; তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে বহু স্তবস্তুতি করিয়া ভাগবতের ভক্তিপক্ষে ব্যাখ্যা জানিবার কারণ প্রভুকে অনুনয় বিনয় করিলেন। প্রভুও কৃপা করিয়া তাঁহাকে ভাগবতের ভক্তিপক্ষের ব্যাখ্যা বুঝাইয়া দিলেন এবং ছাত্রগণকে ঐরূপ বুঝাইবার শক্তি প্রদান করিলেন। সেই অবধি শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিত প্রভুর গণ-মধ্যে পরিগণিত হইলেন।

শ্রীচৈতন্য ভাগবতে যথা—

শুনি দ্বিজ দেবানন্দ প্রভুর বচন।
যোড়হস্তে লাগিলেন করিতে স্তবন॥

জগত উদ্ধার লাগি তুমি কৃপাময়।
নবদ্বীপ মাঝে আসি হইলা উদয়॥
মুঞি পাপী দৈবদোষে তোমা না জানিনু।
তোমার পরমানন্দে বঞ্চিত হইনু॥
সর্ব্বভূতে কৃপালুতা তোমার স্বভাব।
এই মাগো তোমাতে হউক অনুরাগ॥
এক নিবেদন প্রভু তোমার চরণে।
কি করি উপায় প্রভু বলহ আপনে॥
মুঞি অসর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বজ্ঞের গ্রন্থ লৈয়া॥
ভাগবত পড়াঙ আপনে অজ্ঞ হৈয়া॥
কিবা বাখানিব পড়াইব বা কেমনে।
ইহা মোরে আজ্ঞা প্রভু করহ আপনে॥
শুনি তান বাক্য গৌরচন্দ্র ভগবান।
কহিতে লাগিলা ভাগবতের প্রমাণ॥

প্রভু তখন দেবানন্দকে লক্ষ্য করিয়া ভাগবতমহিমা যে বর্ণন করিলেন, তাহা সমবেত সমস্ত লোককে শিক্ষা দিবার জন্য। যথা—

দেবানন্দ পণ্ডিতের লক্ষ্যে সবাকারে।
ভাগবত-অর্থ বুঝাইলেন ঈশ্বরে॥

(শ্রীচৈতন্য ভাবগত)

প্রভু বলিলেন—

ভক্তিযোগ মাত্র ভাগবতের আখ্যান।
আদি মধ্য অন্ত্যে কভু না বুঝয়ে আন॥

না মানয়ে ভক্তি ভাগবতে যে পড়ায়।
ব্যর্থবাক্য ব্যয় করে অপরাধ পায়॥
মূর্ত্তিমন্ত ভাগবত ভক্তিরস মাত্র।
ইহা বুঝে যে হয় কৃষ্ণের প্রিয়পাত্র॥
ভাগবত পুস্তক থাকয়ে যার ঘরে।
কোন অমঙ্গল নাহি যায় তথাকারে॥
ভাগবত পূজিলে কৃষ্ণের পূজা হয়।
ভাগবত পঠন শ্রবণ ভক্তিময়॥

(শ্রীচৈতন্য ভাগবত)

শেষে প্রভু বলিলেন—

চল তুমি যাই অধ্যাপনা কর গিয়া।
কৃষ্ণভক্তি অমৃত সবারে বুঝাইয়া॥

প্রভুর উপদেশবাক্য শিরোধার্য্য করত দেবানন্দ প্রভুকে প্রণাম করিয়া গমন করিলেন। যথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে—

দেবানন্দ পণ্ডিত প্রভুর বাক্য শুনি।
দণ্ডবৎ হইলেন ভাগ্য হেন মানি॥
প্রভুর চরণ কায় মনে করি ধ্যান।
চলিলেন বিপ্র করি বিস্তর প্রণাম॥

কুলিয়ায় নানা লীলা প্রকাশ করিয়া প্রভু নিজ সমভিব্যাহারী ভক্তগণ সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করিবার মানসে চলিলেন। কিন্তু সেবার আর বৃন্দাবনে যাওয়া হইল না, কানাই নাটশালা নামক স্থান পর্য্যন্ত গিয়াই সেইখানে গৌড়ের তাৎকালিক বাদশাহের প্রধান অমাত্যদ্বয় সাকর মল্লিক ও দবীরখাস দুই ভাইকে কৃপা করিয়া তাহাদের কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করিলেন। ইঁহারাই ভবিষ্যতে শ্রীরূপ গোস্বামী ও শ্রীসনাতন গোস্বামী নামে প্রসিদ্ধ হইয়া প্রধান বৈষ্ণব মোহান্ত গুরু মধ্যে গণ্য ও মান্য হইয়াছিলেন। প্রভু নিজভক্ত-মাহাত্ম্য লোক মধ্যে প্রদর্শন জন্য করিলেন কি? না সাকর মল্লিক ও দবীরখাসকে চরণে আশ্রয় দিয়া বক্রেশ্বর প্রভৃতি নিজসঙ্গী ভক্তগণকে বলিলেন "তোমরা এই দুই ভাইকে দয়া করিয়া ভবসাগর হইতে উদ্ধার কর, কারণ তোমরা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়জন, এজন্য জীবের সংসারসমুদ্র পার করিবার উপযুক্ত কাণ্ডারী"।—যথা—

দোঁহা আলিঙ্গিয়া প্রভু কহিল ভক্তগণে।
সবে কৃপা করি উদ্ধারহ দুই জনে॥

(শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত)

প্রভুর আজ্ঞা পাইয়া সাকর মল্লিক ও দবীরখাস দুইজনে ভক্তগণের চরণে পতিত হইলেন এবং বক্রেশ্বর প্রভৃতি ভক্তগণ তাঁহাদের ধন্য ধন্য করিলেন। যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

দুইজনে প্রভুকৃপা দেখি ভক্তগণে।
হরি হরি বোলে সবে আনন্দিত মনে॥

নিত্যানন্দ শ্রীবাস হরিদাস গদাধর।
মুকুন্দ জগদানন্দ মুরারি বক্রেশ্বর॥
সবার চরণ ধরি পড়ে দুই ভাই।
সবে কহে ধন্য তুমি পাইলে গোঁসাই॥

প্রভু কানাই নাটশালা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া গৌড়ের ভক্তগণের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাদের রথোপলক্ষে নীলাচল যাইবার আদেশ দিয়া, নীলাচলবাসী নিত্যসেবক ভক্তগণের সমভিব্যাহারে নীলাচলে ফিরিয়া আসিলেন। এবং ঐ যে কাশীমিশ্রের বাটী তাঁহার আশ্রম ছিল, সেইখানেই নব নব লীলা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ঐ আলয়েই শ্রীগৌর-সুন্দরের গাদি ছিল। সেইখানেই গম্ভীরা। ঐ গম্ভীরা একটী অপ্রসর স্থান, তাহাতে কষ্টেসৃষ্টে একজন শয়ন করিতে পারে। ঐ গম্ভীরায় আমাদের কাঙ্গাল কৌপীনধারী শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেব আঠার বৎসর কাল বাস করিয়াছিলেন। প্রভুর অপ্রকটের পর শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতই ঐ গাদি প্রাপ্ত হইয়া ঐ আশ্রমের মোহান্ত ছিলেন। ঐ আশ্রমে যে গম্ভীরায় মহাপ্রভু থাকিতেন, সেইখানে মহাপ্রভুর করঙ্গ ও খড়ম অদ্যাবধি দেবমূর্ত্তি স্বরূপে পূজিত হইয়া আসিতেছেন। মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর ভক্তগণের যে কি শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। তাঁহারা আপনাপন আশ্রমে বসিয়া দিন-যামিনী কেবল নয়নাশ্রু বর্ষণ করিতেন। শোকে একেবারে নিশ্চেষ্ট ও স্পন্দরহিত হইয়া গিয়াছিলেন। দেখিলে বোধ হইত যেন প্রস্তরের মূর্ত্তি বসিয়া আছেন। অনবরত যে তাঁহাদের চক্ষের জল প্রবাহিত হইত তাহাতেই, এবং মধ্যে মধ্যে যে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেন তাহাতেই,

বুঝা যাইত যে, এখনও প্রাণবায়ু আছে। প্রভুর অপ্রকটের অতি অল্পদিনের মধ্যেই ভক্তগণ ক্রমে ক্রমে একে একে তিরোধান করিলেন। তাহা ত হইবারই কথা; কারণ গৌরগতপ্রাণ ভক্তবৃন্দ আর গৌরবিচ্ছেদ-যাতনা সহ্য করিয়া কত কাল জীবিত থাকিতে পারেন? মহাপ্রভুর তিরোধানের অব্যবহিত কাল পরে শ্রীনিবাস নামক একজন শক্তিধর ভক্তযুবক নীলাচলে আগমন করেন। ইনি গৌড়দেশবাসী যুবক। কিশোরবয়সেই কৃষ্ণপ্রেমে মগ্ন হয়েন এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুকে দর্শন করিতে আকুলচিত্ত হইয়া নীলাচলে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে প্রভুর তিরোধানের সংবাদ পাইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন এবং প্রত্যাদেশ-বাণী দ্বারা আদিষ্ট হইয়া, নীলাচলে গদাধর পণ্ডিত প্রভৃতি ভক্ত-গণকে দশন করিবার জন্য আগমন করেন। এই শ্রীনিবাস নামক ব্রাহ্মণযুবক পরে শ্রীবৃন্দাবনে গোস্বামিমণ্ডল দ্বারা আচার্য্য প্রভু পদবী লাভ করিয়াছিলেন এবং তিনিই গৌড়দেশে প্রথমে শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। যখন তিনি নীলাচলে মহাপ্রভুর আশ্রমে আসিয়াছিলেন, তখন শ্রীপাদ বক্রেশ্বর প্রভুই আশ্রমের মোহান্ত ছিলেন, তাঁহাকে দর্শন করিয়া এবং তাঁহার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া ধন্য হয়েন। যথা ভক্তিরত্নাকরে—

চলিলেন শ্রীনিবাস বিহ্বল অন্তর।
যথা বসিয়াছেন পণ্ডিত বক্রেশ্বর॥
ভূমে পড়ি তাঁর পাদপদ্মে প্রণমিলা।
শ্রীনিবাসে দেখি শ্রীপণ্ডিত সুখী হৈলা॥

আইস বাপ বলি তুলি লইলেন কোলে।
শ্রীনিবাস অঙ্গে সিঞ্চিলেন নেত্রজলে॥
বসাইল নিকটে বাৎসল্য অতিশয়।
অঙ্গে হস্ত দিয়া কথা কহে সুধাময়॥
ভাল হইলা আইলা শীঘ্র দেখিনু তোমারে।
বহুকার্য্য প্রভু সাধিবেন তোমা দ্বারে॥
এত কহি অধৈর্য্য হইলা মহাশয়।
পরম বাৎসল্যে পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গয়॥
যদ্যপিহ শ্রীনিবাসে নারয়ে ছাড়িতে।
তথাপিহ আজ্ঞা দিলা সবারে মিলিতে॥

ঐ সময়ের অল্পদিন পরেই শ্রীপণ্ডিত বক্রেশ্বর প্রভু তিরোধান করেন। কারণ ইহার কিছুকাল পরে যখন গৌড়দেশের আর একটী শক্তিধর ভক্ত নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় নীলাচলে আগমন করেন, তখন তিনি আর প্রভু বক্রেশ্বরের দর্শনলাভ করিতে পারেন নাই। ঠাকুর মহাশয় ঐ আশ্রমে শ্রীগোপাল গুরু মোহান্তের দর্শনলাভ করেন। ইনি শ্রীবক্রেশ্বরের অতি অন্তরঙ্গ ভক্ত ও সেবক ছিলেন এবং শ্রীপণ্ডিত প্রভুর তিরোধানের পর তিনিই ঐ আশ্রমের গাদি প্রাপ্ত হয়েন। শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাপ্রভুর ঐ আশ্রমে তাঁহার শয্যাদি দর্শন করিয়া অতিশয় ব্যাকুলচিত্ত হইয়া উঠিলেন। শ্রীগোপাল গুরু গোস্বামী তাঁহাকে শ্রীপণ্ডিত বক্রেশ্বরের মধুর চরিত্রাদি কহিয়া প্রবোধিত করিলেন। যথা—

নরোত্তম দেখি প্রভুর শয়ন আসন।
ভূমে লোটাইয়া কৈল অনেক ক্রন্দন॥

শ্রীগোপাল গুরু অতি অধৈর্য্য হিয়ায়।
নরোত্তমে কোলে লইয়া কান্দে উভরায়
শ্রীগোপাল গুরু কতক্ষণে স্থির হইয়া।
নরোত্তমে স্থির কৈল কত প্রবোধিয়া॥
যথা যথা প্রভু ভাবাবেশে মগ্ন হইলা।
সে সকল স্থান নরোত্তমে দেখাইলা॥
শ্রীবক্রেশ্বরের চারু-চরিত্র কহিল।
শ্রীরাধাকান্তের পাদপদ্মে সমর্পিল॥

সপ্তম অধ্যায়



পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, শ্রীমৎ বক্রেশ্বর পণ্ডিত নিমানন্দ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। এক্ষণে ঐ নিমানন্দ সম্প্রদায়টী কি ও তৎসম্বন্ধে শ্রীপণ্ডিত বক্রেশ্বরের সাম্প্রদায়িক ইতিবৃত্তের সংক্ষিপ্ত পর্য্যালোচনা করা যাইতেছে।

হিন্দুধর্ম্মমতে মন্ত্রাশ্রয় অতীব প্রয়োজনীয়। যথা—পাদ্মে মহাদেববাক্য—

ন্যাসে বাপ্যর্চ্চনে বাপি মন্ত্রমেকান্তমাশ্রয়েৎ॥

অর্থ—ন্যাসেই হউক বা অর্চ্চনাতেই হউক একান্ত ভাবে মন্ত্র আশ্রয় করিবে।

মন্ত্র গুরুর নিকট হইতে গ্রহণ করিতে হয়। মন্ত্র কি না গুরুপরম্পরাগত সদুপদেশ। এবং তাহা গুরুর নিকট হইতে গ্রহণ করাকে দীক্ষাগ্রহণ বলে। বৈষ্ণবশাস্ত্রমতে কৃষ্ণমন্ত্র

উপযুক্ত গুরুর নিকটই গ্রহণ করিতে হইবে। এবং ঐ মন্ত্রদীক্ষা দিবার উপযুক্ত গুরু কে, তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রবাক্য এই যে, বিষ্ণু-পরায়ণ সম্প্রদায়ভুক্ত গুরুই দীক্ষা দিবার যোগ্য। যথা—পাদ্মে—

গুরুরেকঃ কৃষ্ণমন্ত্রে বৈষ্ণবঃ সাম্প্রদায়িকঃ।

অর্থাৎ যিনি বৈষ্ণব অর্থাৎ বিষ্ণুপরায়ণ এবং সাম্প্রদায়িক, শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রে একমাত্র তিনিই গুরুর আসন পাইবার যোগ্য। উক্ত উভয়-গুণভূষিত না হইলে গুরু হইবার উপযুক্ত কেহই হইতে পারেন না ও এরূপ অযোগ্য গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলে কোন ফল হয় না। যথা—পাদ্মে—

অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ ন পরা গতিঃ।

অর্থ—অবৈষ্ণবের উপদিষ্ট মন্ত্র দ্বারা পরা গতি লাভ হয় না। বরং শাস্ত্রে আছে যে, তাহাতে ক্ষতিই হইয়া থাকে অর্থাৎ নরক-গমন হয়। যথা—নারদ পঞ্চরাত্রে—

অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।

অর্থাৎ অবৈষ্ণবের উপদিষ্ট মন্ত্র দ্বারা নরকে গমন হয়।

অবৈষ্ণব স্থানে যদি বিষ্ণুমন্ত্র লয়।
নরক-গমন সেই পশ্চাতে করয়॥

শ্রীভক্তমাল।

অবৈষ্ণব গুরু সম্বন্ধেও যেরূপ, সেইরূপ সাম্প্রদায়িক গুরুর নিকটও মন্ত্র না লইলে কোন ফল হয় না। যথা পাদ্মে—

সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ।
সাধনৌঘৈর্ন সিধ্যন্তি কোটিকল্পশতৈরপি॥

অর্থ—যে সকল মন্ত্র সম্প্রদায়-বিহীন, সেই সকল মন্ত্র নিষ্ফল। বহু সাধনসমূহে শতকোটিকল্প কালেও সেই সকল মন্ত্র সিদ্ধ হয় না।

সম্প্রদা বিহীন গুরু আশ্রয় যে করে।
নিষ্ফল তাহার সব ভক্তি নাহি স্ফুরে॥

শ্রীভক্তমাল।

অন্যত্র যথা—

বিনে সম্প্রদায়ী গুরু উপদেশ ব্যর্থ।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু না যায় অনর্থ॥

শ্রীভক্তমাল।

অতএব শাস্ত্রবাক্য দ্বারা স্পষ্ট উপলব্ধি হইতেছে যে, সম্প্রদায় বৈষ্ণবধর্ম্মের পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয়। সম্প্রদায়ের অর্থ এই যে, গুরুপরম্পরাগত সদুপদিষ্ট ব্যক্তিসমূহ। অতএব সম্প্রদায় থাকিলেই সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক মানিতেই হইবে। এবং কলি-যুগে চারিজন সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং তাঁহারা যে ঐরূপ সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক হইবেন, তাহা পূর্ব্বেই শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।—পদ্মপুরাণের একটী শ্লোক সেই নির্দ্দিষ্ট বাক্য—

শ্লোকার্থ—যথা—"কলিযুগ-আরম্ভে চারিটী সম্প্রদায়ী বা সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক হইবেন। শ্রী, ব্রহ্মা, রুদ্র ও সনক, এই চারিজন ভুবনপাবন বৈষ্ণব কলিকালে সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক হইবেন।

এই চারি সম্প্রদায়ে চারিজন প্রধান মোহান্ত আবির্ভূত হইয়াছিলেন। যথা ভক্তমালে—

শ্রীসম্প্রদায় গুরু শ্রীল রামানুজ স্বামী।
চতুর্ম্মুখ সম্প্রদায় মধ্বাচার্য্য নামী॥
বিষ্ণুস্বামী মোহান্ত শ্রীরুদ্র সম্প্রদায়।
নিম্বাদিত্য চতুঃসন সনক সম্প্রদায়॥

অর্থাৎ লক্ষ্মীদেবী রামানুজকে, ব্রহ্মা মধ্বাচার্য্যকে, মহাদেব শ্রীবিষ্ণুস্বামীকে এবং চতুঃসন নিম্বাদিত্যকে স্ব স্ব সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তনক্ষম বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, এবং ঐ চারিজনও সামান্য মনুষ্য ছিলেন না; তাঁহারা ভগবানের অংশ স্বরূপে কলিকালে জীব উদ্ধারের জন্য জন্ম পরিগ্রহ করেন। শ্রীভক্ত-মাল গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে যে, শ্রীহরি পূর্ব্বে চতুর্ব্বিংশতি দেহ ধারণ করেন। কলিতে তাঁহার চারিটী দেহ প্রকাশ হইয়াছে। যথা—

প্রথমাবতার চতুর্ব্বিংশতির মধ্যে।
হরির আবেশ রামানুজ আদি পদ্মে॥
বিষ্ণুস্বামী মধ্বাচার্য্য তথা নিম্বাদিত্য।
চারি সম্প্রদায়ে চারি আচার্য্য বিদিত॥
কলি ভব সুদুস্তরে জীব নিস্তারিতে।
ভগবান্ অংশে আবির্ভাব পৃথিবীতে॥

তাঁহাদের অসাধারণ ও অদ্বিতীয় পাণ্ডিত্য ও বিচারশক্তি-প্রভাবে কুতার্কিকদিগের গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়া অপধর্ম্মসমূহ-প্রচারণ একেবারেই বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। যথা ভক্তমালে—

চারি সম্প্রদায় চারি আচার্য্য মহান্ত।
বেদের স্বরূপ বেদবিধি বিজ্ঞ অন্ত॥

বিচারে পাণ্ডিত্যেতে অদ্বিতীয় অপার।
কু-সিদ্ধান্তবাদি-পরাভবে খড়গধার॥

এই যে সনক সম্প্রদায়ী নিম্বাদিত্য বা নিম্বার্কস্বামী, তাঁহা হইতে যে সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়, তাহার নাম নিম্বাদিত্য-সম্প্রদায়। ৺ হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয় শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকান্তর্গত তাঁহার লিখিত প্রবন্ধ মধ্যে লিখিয়াছেন যে, "বোম্বাই পুনা বারাণসী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নগরে সাধু সমাজ কর্তৃক বহু বিচারান্দোলনের পর ভক্তিমালা বা হরিভক্তিপ্রকাশিকা নামে (দেবনাগরাক্ষরে হিন্দি গদ্যভাষায়) যে একখানি বিস্তৃত গ্রন্থ বহুকাল হইল প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার ভিতর বহু বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পরিচয়, সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তৎসহিত ধারাবাহিক কুড়শীনামা আছে।" ভক্তিনিধি মহাশয় ঐ গ্রন্থ হইতে সনকসম্প্রদায়ের প্রণালীগত প্রথম প্রতিষ্ঠাতা হইতে সমুদয় মোহান্তগণের নাম পর্য্যায়ক্রমে লিখিয়াছেন এবং বলেন যে "ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত (৩৮) পর্য্যায় লিখিত সিদ্ধ মহাপুরুষ শ্রীমন্নারায়ণ স্বামী দক্ষিণ দেশ হইতে তীর্থপর্য্যটনে বাহির হইয়া গঙ্গা যমুনা সরস্বতী এই মুক্তবেণী স্থান ত্রিবেণী তীর্থে অবগাহনার্থে যৎসময় বঙ্গে আগমন করেন, তৎসময় তৎতীরবর্ত্তী পণ্ডিত বক্রেশ্বর তাঁহার নিকট বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন।" ভক্তিনিধি মহাশয় আরও বলেন যে "উক্ত গ্রন্থের কুড়শীনামা পদ্ধতিতে দ্রাবিড়, কাশ্মীর, আজমীর, গুজরাট, গৌড়, উৎকল, বঙ্গ, কলিঙ্গ, ত্রৈলোঙ্গ, মালবার প্রভৃতি প্রদেশস্থ অনেকেই শিষ্যভাবে ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া বিদিত। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা প্রধান, কেবল গুরুপর্য্যায়ে তাঁহাদিগের নাম এবং

তাঁহাদেরই সংক্ষিপ্ত জীবনী আছে। পণ্ডিত বক্রেশ্বর মহান্ত ছিলেন না। এজন্য গুরুপর্য্যায়ে তাঁহার নাম কি জীবনচরিত নাই, কেবল শিষ্যপর্য্যায়ে নাম আছে মাত্র।"

ভক্তিনিধি মহাশয় ঐ গ্রন্থ অবলম্বনে নিমানন্দ সম্প্রদায় সম্বন্ধে বলেন যে "সনকসম্প্রদায়ের গুরু নিম্বার্কস্বামী হইতেই তৎশিষ্য-প্রশিষ্যক্রমে প্রথমতঃ নিম্বার্ক-সম্প্রদায় নামে এক সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়, পরে ঐ সম্প্রদায়ের নাম হয় নিম্বাদিত্য-সম্প্রদায়, আবার তাহার পরিবর্ত্তে ঐ সম্প্রদায় নিমানন্দ-সম্প্রদায় বলিয়া কথিত হয়।"

কিন্তু উপর্য্যুক্ত গ্রন্থের লিখিত মতের সহিত "অনুরাগবল্লী" নামক যে একখানি সাম্প্রদায়িক-নিরূপণ ভাষা-গ্রন্থ ১৬১৮ শাকে শ্রীমনোহর দাস রচিত করেন, তাহার সহিত ঐক্য দেখা যায় না। তাহাতে পণ্ডিত বক্রেশ্বরের শ্রীমন্নারায়ণ স্বামীর নিকট বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইবার বিষয়ে কোন প্রসঙ্গ নাই। ভক্তিনিধি মহাশয়ও ঐ বিষয় নিজ প্রবন্ধ মধ্যে উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন যে, "অনুরাগবল্লী" গ্রন্থখানি যখন আজি কালিকার নহে, ২০০ শত বৎসরের অধিক কালের লেখা, তখন মতভেদ হইলেও প্রাসঙ্গিক।"

আমরা অনুরাগবল্লী গ্রন্থখানি সম্প্রদায় সম্বন্ধে অতি প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া আদরণীয় জ্ঞান করি। বৈষ্ণবগণের চারি সম্প্রদায়ের বিষয় যেরূপ ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে, এরূপ বিশদ বিবরণ আর অন্য কোন গ্রন্থে দেখা যায় না। যদি বক্রেশ্বরের সনক সম্প্রদায়ী শ্রীমন্নারায়ণ স্বামী হইতে মন্ত্রগ্রহণ-কথা ২০০ শত বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশ থাকিত, তাহা হইলে ঐ গ্রন্থে তাহার উল্লেখ অবশ্যই থাকিবার সম্ভাবনা ছিল। তাহা না

থাকায় হিন্দিভাষায় লিখিত ঐ "হরিভক্তি প্রকাশিকা" নামক গ্রন্থখানির ঐ মতটী অতি সাবধানতার সহিত গ্রহণ করিতে হইতেছে। যাহা হউক শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত পূর্ব্বোক্ত চারি সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব মোহান্ত ছিলেন, তাহা নির্ণয় করা আমাদের তত প্রয়োজন ছিল না। তবে ভক্তিনিধি মহাশয় যে বলিয়াছেন, যে নিমানন্দ সম্প্রদায়ের শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, তাহা আর কিছুই নহে, কেবল নিম্বাদিত্য সম্প্রদায় নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া নিমানন্দ সম্প্রদায় নাম হইয়াছে, ঐ মতটী অনুরাগবল্লী গ্রন্থের অনুমোদিত নহে, তাহা ঐ গ্রন্থের লিখিত বিবরণ দ্বারাই প্রকাশ পাইতেছে। ভক্তিনিধি মহাশয় ঐ হিন্দিভাষার গ্রন্থখানি অবলম্বনে সনক-সম্প্রদায়ী মোহান্তগণের যে কুড়শীনামা দিয়াছেন, ঐ কুড়শীনামার পর্য্যায়ের ও মোহান্তগণের নামের সহিত অনুরাগবল্লীর লিখিত পর্য্যায় ও নামের মিল দেখা যায়। কেবল দুই এক স্থলে নামের সামান্য অনৈক্য এবং দুই এক স্থলে নামের একটু অগ্রপশ্চাৎ পরিবর্ত্তন মাত্র দৃষ্ট হয়। যে বিশেষ অনৈক্য দেখা যায়, তাহা কেবল নিম্বার্ক ও নিম্বাদিত্য এই দুইটী নাম লইয়া। হিন্দি হরিভক্তিপ্রকাশিকা গ্রন্থাবলম্বনে ভক্তিনিধি মহাশয় যে কুড়শীনামা দিয়াছেন, তাহার (৪) পর্য্যায়ে নিম্বার্কস্বামীর নাম লিখিত হইয়াছে, কিন্তু অনুরাগ-বল্লীর লিখিত মোহান্তগণের ধারাবাহিক নামের তালিকায় নিম্বার্ক বলিয়া কোন নাম দেখা যায় না; তাহাতে (২৪) পর্য্যায়ে নিম্বা-দিত্যস্বামী নাম লিখিত আছে; কিন্তু ভক্তিনিধি মহাশয়ের প্রদত্ত কুড়শীনামায় নিম্বাদিত্য নাম নাই। এক্ষণে যদি নিম্বার্ক ও নিম্বাদিত্য একই মহাত্মার নাম হয়, তাহা হইলে

পর্য্যায় সম্বন্ধে বিলক্ষণ অনৈক্য বলিতে হইবে; কারণ একটী তালিকায় (৪) পর্য্যায়ে যে নাম, অপর তালিকায় (২৪) পর্য্যায়ে সে নাম হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভব হইতে পারে না। ইহার সামঞ্জস্য করিবার চেষ্টা করা আমাদের এস্থলে তত প্রয়োজন নাই; কারণ সনকসম্প্রদায়ী কোন মোহান্তের সময়ে নিম্বাদিত্য-সম্প্রদায় বলিয়া যে নাম প্রচলিত হইয়াছিল, তাহাতে যখন কোন সন্দেহ নাই, তখন সেই সম্প্রদায়ের নাম তৎপূর্ব্বে নিম্বার্ক সম্প্রদায় থাকুক বা না থাকুক, তাহাতে কিছু আইসে যায় না। আমাদের এস্থলে বিবেচ্য যে, নিম্বাদিত্য সম্প্রদায় নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া নিমানন্দ সম্প্রদায় হইয়াছে কি না—যাহা ভক্তি-নিধি মহাশয় বলেন, তাহা সম্ভব কি না? অনুরাগবল্লীমতে তাহা কোন ক্রমেই সম্ভব নহে।

উভয় কুড়শীনামায় (৩৫) পর্য্যায়ে শ্রীহরিব্যাস বা শ্রীহরিরাম ব্যাস মোহান্তের নামের মিল দেখা যাইতেছে, এবং উভয় কুড়শী-নামাতেই (৩৮) পর্য্যায়ে শ্রীনারায়ণ স্বামী মোহান্তের নামেরও মিল আছে। যদি ঐ শ্রীমন্নারায়ণ স্বামীর নিকট শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতের বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণের কথা সত্য হয়, এবং নিম্বাদিত্য সম্প্রদায় নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া শ্রীবক্রেশ্বরের সময় নিমানন্দ নাম হওয়া প্রকৃত হয়, তাহা হইলে শ্রীনারায়ণ স্বামীর সময় পর্য্যন্ত ঐ নিম্বাদিত্য সম্প্রায় নাম প্রচলিত ছিল, অবশ্যই বলিতে হইবে; কারণ তাহা না হইলে আর ঐ পূর্ব্ব-নাম-পরিবর্ত্তনে এই নূতন নাম হওয়া সম্ভব হইতে পারে না। কিন্তু অনুরাগ-বল্লী গ্রন্থের মতে তাহা কোন মতেই হইবার সম্ভাবনা নাই; কারণ তদ্দ্বারা প্রকাশ যে, শ্রীমন্নারায়ণ স্বামীর বহু পূর্ব্ব হইতে নিম্বাদিত্য নাম প্রচলিত ছিল না। ঐ প্রামাণিক গ্রন্থখানির

মতে ঐ (৩৫) পর্য্যায়ে যে হরিব্যাস বা হরিরাম ব্যাস মোহান্ত ছিলেন, তাঁহার সময়েই নিম্বাদিত্য-সম্প্রদায় নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া তাহার হরিব্যাসী সম্প্রদায় বলিয়া আখ্যা হইয়াছিল। যথা অনুরাগবল্লীতে—

শ্রীনিম্বাদিত্য অনেক শাখা উপরান্ত।
মহা ভাগবত তেঁহো হইলা মহান্ত॥
সেই হইতে নিম্বাদিত্য সম্প্রদায় বলি।
কথোক সময় হেন মতে গেল চলি॥
ক্রমে কথোক কাল পাছে শ্রীহরি ব্যাস।
মহান্ত হইলা ভক্তে সুদৃঢ় বিশ্বাস॥
সেই হৈতে হরিব্যাসী সম্প্রদায় কহে।
সংক্ষেপ কহিল বহু বিস্তারিল নহে॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব হইতে যে নিমানন্দ সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে এবং যাহার প্রবর্ত্তক শ্রীমৎ বক্রেশ্বর পণ্ডিত, ঐ সম্প্রদায়! ৺হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয়ের অবলম্বিত শ্রীহরিভক্তিপ্রকাশিকা নামক হিন্দি গ্রন্থের মতানুসারে চারিটী আদি সম্প্রদায়ের মধ্যে সনকসম্প্রদায়েরই শাখা বলিয়া বর্ণিত; কিন্তু শ্রীমন্মনোহর দাস গোস্বামি-বিরচিত প্রামাণিক ঐ অনুরাগবল্লী গ্রন্থমতে নিমানন্দ সম্প্রদায়, আদি মাধ্বী সম্প্রদায় হইতেই উৎপন্ন বলিয়া লিখিত হইয়াছে। তাহাতে স্পষ্টই লিখিত আছে যে, শ্রীমৎ ঈশ্বরপুরী পর্য্যন্ত ঐ সম্প্রদায়ের নাম, মোহান্ত শ্রীলশ্রীমধ্বাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত বলিয়া, মাধ্বী সম্প্রদায় নামে কীর্ত্তিত ছিল। পরে যখন মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব ঐ মোহান্ত শ্রীঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ঐ পুরী গোসাঁইকে

ও তাঁহার সম্প্রদায়কে ধন্য করিয়াছিলেন, সেই সময় হইতে মহাপ্রভুর ইচ্ছানুসারেই সম্প্রদায়ের নাম হইল নিমানন্দ সম্প্রদায়। প্রভুর সর্ব্বপ্রথম নাম যে নিমাই, তাহা হইতেই ঐ আখ্যা হয়। যথা অনুরাগবল্লীতে—

আদৌ শ্রীমধ্বাচার্য্য ভাষ্যকার হয়।
মাধ্ব-ভাষ্যে ভক্তিতত্ত্ব করিয়াছে নির্ণয়॥
ঈশ্বর পুরী গোসাঞি পর্য্যন্ত এই মতে॥
মাধ্ব সম্প্রদায় বলি জগত বিখ্যাতে॥
শ্রীমহাপ্রভু যবে প্রকট হইলা।
সর্ব্বনাম-পূর্ব্বে নাম নিমাই পাইলা॥
সেইনামে মহাপ্রভুর স্বেচ্ছা অনুক্রমে।
নিমানন্দী সম্প্রদায় হইল নিয়মে॥

তথা শ্রীভক্তিরত্নাকরে—

প্রভুর অদ্ভুত শক্তি কে পারে বুঝিতে।
নিমানন্দ সম্প্রদায় হৈল প্রভু হৈতে॥
প্রভু-নাম মধ্যে মুখ্য নিমাই পণ্ডিত।
নিত্যানন্দ প্রভুর এ নামে অতি প্রীত॥
নিমাই প্রদান কৈলা জগতে আনন্দ।
এই হেতু অবনী-বিখ্যাত নিমানন্দ॥

মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীবৈকুণ্ঠপতি নারায়ণরূপে জগতের গুরু হইয়া পুরী গোসাঁইর নিকট শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন ইহা আশ্চর্য্য হইলেও, বুঝা যায় যে, এই অবতার-লীলার উদ্দেশ্যই ছিল—শিক্ষা দ্বারা লোককে ধর্ম্মপরায়ণ করা। এই

জন্য পদ্মপুরাণীয় পূর্ব্বোক্ত বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন জন্য ভক্তের ধর্ম্ম নিজে আচরণ করিয়া লোক শিক্ষা কার্য্য সম্পন্ন করত লোককে ভক্তিপথে আনয়ন করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু সুতরাং মাধ্বীসম্প্রদায়ী বৈষ্ণব হইয়াছিলেন। প্রভুর প্রধান পার্ষদ শ্রীমৎবক্রেশ্বর পণ্ডিতের প্রধান শিষ্য শ্রীমদ্-গোপাল গুরুকৃত ঐ সম্প্রদায়-প্রণালী নির্ণীত হইয়াছে। যথা তৎকৃত শ্লোক ও অর্থ—

শ্রীমন্নারায়ণো ব্রহ্মা নারদো ব্যাস এব চ।
শ্রীলমধ্বঃ পদ্মনাভো নৃহরির্মাধবস্তথা॥
অক্ষোভো জয়তীর্থশ্চ জ্ঞানসিন্ধুর্মহানিধিঃ।
বিদ্যানিধিশ্চ রাজেন্দ্রো জয়ধর্ম্মমুনিস্তথা॥
পুরুষোত্তমশ্চ ব্রহ্মণ্যো ব্যাসতীর্থমুনিস্তথা।
শ্রীমান্ লক্ষ্মীপতিঃ শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরীশ্বরঃ॥
ততঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ প্রেমকল্পদ্রুমো ভুবি।
নিমানন্দাখ্যয়া যোহসৌ বিখ্যাতঃ ক্ষিতিমণ্ডলে॥

অর্থ—শ্রীমান্ নারায়ণ, ব্রহ্মা, নারদ, ব্যাস, শ্রীল মধ্ব, পদ্মনাভ, নরহরি, মাধব, অক্ষোভ, জয়তীর্থ, জ্ঞানসিন্ধু, মহানিধি, বিদ্যানিধি, রাজেন্দ্র, জয়ধর্ম্ম মুনি, পুরুষোত্তম, ব্রহ্মণ্য, মুনি ব্যাসতীর্থ, শ্রীমান্ লক্ষ্মীপতি, শ্রীমান্ মাধবেন্দ্রপুরী, ঈশ্বরপুরী, তাহার পর প্রেমকল্পতরু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য। এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সম্প্রদায় ক্ষিতিমণ্ডলে "নিমানন্দ সম্প্রদায়" বলিয়া বিখ্যাত। এই সম্প্রদায় মাধ্বী সম্প্রদায় হইতেই উৎপন্ন হওয়া প্রকাশ হইতেছে এবং শ্রীমদ্ গোপালগুরু গোস্বামী নিজ সম্প্রদায়েরই প্রণালী নির্ণয় করিয়াছিলেন, উপলব্ধি হইতেছে। ঐ যে

গোপালগুরুকৃত সম্প্রদায়-নির্ণয়-পত্রিকা, তাহা অনুরাগবল্লী-প্রণেতা শ্রীমন্মনোহর দাস অনেক অনুসন্ধানে শ্রীমদ্ গোপাল গুরুর পরিবারভুক্ত জনৈক প্রাচীন বৈষ্ণবের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহা তাঁহার প্রণীত ঐ গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে। যথা—

তবে শ্রীবৃন্দাবন মথুরায় চারি।
সম্প্রদায় তাঁ সভারে করিল পুছারী॥
তিন সম্প্রদায় আপন গুরুর প্রণালী।
আনিয়া দিলেন তাহা দেখিল সকলি॥
মহাপ্রভুর সম্প্রদায় বিবরণ না পাঞা।
সর্ব্বত্র তপাস করি চিন্তিত হইয়া॥
এই মত কথো দিন ঢুঁড়িতে ঢুঁড়িতে।
আচম্বিতে পাইলাঙ প্রভুর কৃপাতে॥
শ্রীজীব গোস্বামীর কুঞ্জে এক জন।
শ্রীগোপাল গুরু গোঁসাইর পরিবার হন॥
রাধাবল্লভ দাস নাম প্রাচীন বৈষ্ণব।
তাঁরে নিবেদন কৈলোঁ এ আখ্যান সব॥
তিঁহো কহেন শ্রীগোপাল গুরু গোসাঞি।
ইহার নির্ণয় করিয়াছেন চিন্তা নাঞি॥
এত কহি মোরে এক পত্র পুরাতন।
কৃপা করি দিয়া কৈল সন্দেহ ছেদন॥
মহাপ্রভুর পার্ষদ পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
তাঁহার সেবক শ্রীগোপাল গুরুবর॥

শ্রীহরিনাম ব্যাখ্যা সম্প্রদা নির্ণয়।
আগেই করিয়া রাখিয়াছেন মহাশয়॥

অষ্টম অধ্যায়।

এই অধ্যায়ে শ্রীমদ্‌বক্রেশ্বর পণ্ডিতের শিষ্য-প্রশিষ্য-ক্রমে নিমানন্দ সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণের বিষয় যৎ কিঞ্চিৎ অবগত আছি, তাহাই বর্ণনা করা হইল। জনৈক ভক্ত বৈষ্ণবের নিকট আমি একখানি লিখন প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তাহাতে শ্রীমৎ বক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রভুর শিষ্য সম্বন্ধে লিখিত ছিল, যথা—

চন্দ্রশেখর শঙ্করারণ্য আচার্য্য এই দুই জন।
গোবিন্দানন্দ দেবানন্দ কহিল কথন॥
গোপাল গুরু গোস্বামীর গুণের নাই লেখা।
বক্রেশ্বর পণ্ডিতের এই পঞ্চ শাখা॥

লিপিখানির লিখন সত্যই বটে যে, শ্রীমদ্ গোপাল গুরু গোস্বামীর গুণের সীমা নাই। তিনি পণ্ডিত প্রভুর অতিশয় প্রিয়তম সেবক ছিলেন, এবং পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে কাশীমিশ্রের আলয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে আশ্রম ছিল, ঐ আশ্রমের গাদিতে মহাপ্রভুর পর শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত আসন প্রাপ্ত হইয়া কিছু কাল পরে অপ্রকট হইলে সেই গাদি শ্রীমদ্ গোপাল গুরু গোস্বামীই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি ঐ মঠে মোহান্তাসনে আসীন

থাকা-সময়ে ঐ মঠের মধ্যে শ্রীরাধাকান্ত নামে সেবা প্রতিষ্ঠিত করেন। যথা অনুরাগবল্লী গ্রন্থে—

তাঁর পাট নীলাচলে রাধাকান্তের সেবা।
অতি মনোহর তাহা বর্ণিবেক কেবা॥

ঐ নীলাচলের পাটবাড়ী নিমানন্দ সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণের বড় মঠ বলিয়া অদ্যাপি প্রসিদ্ধ। এতদ্ব্যতীত শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীজীব গোস্বামীর কুঞ্জের মধ্যে ঐ সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণের আর একটী পাটবাটী আছে, তাহা ছোট মঠ বলিয়া আখ্যাত। ঐ পাটবাড়ীরও প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমদ্ গোপাল গুরু গোস্বামী এবং তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্য-ক্রমে ঐ পাটবাটী চলিয়া আসিয়াছে। এতৎসম্বন্ধে ৺হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধ মধ্যে লিখিয়াছেন যে "এই গোপাল গুরু শ্রীবৃন্দাবনধামে শ্রীশ্রীপ্রভু জীব গোস্বামীর নিকটে থাকিয়া বহু শিষ্য করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনস্থ সেই সকল তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্য ভক্তগণ "নিমাই সম্প্রদায়ী" এবং "স্পষ্ট-দায়ীক" বৈষ্ণব বলিয়া অভিহিত"। ঐ বৈষ্ণবগণের মধ্যে জনৈক রাধা বল্লভ দাস নামক বৈষ্ণবের নিকটই অনুরাগবল্লী-প্রণেতা শ্রীমদ্ মনোহর দাস গোস্বামী শ্রীমদ্ গোপাল গুরু কৃত মহাপ্রভুর সম্প্রদায়-নির্ণায়ক পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ইহাঁর গোপাল গুরু নাম হইবার সম্বন্ধে সাধুশ্রুতি এইরূপ অবগত হইয়াছি,—যৎকালে তিনি শ্রীপ্রভু জীব গোস্বামীর নিকট থাকিতেন, তখনই তিনি ঐ শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদের দ্বারাই এই "গুরু" উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। কিংবদন্তী এই যে, শ্রীজীব গোস্বামি-পাদের রসনায় শ্রীহরিনাম অনুক্ষণ অবিরাম ভাবে রটিত হইত বলিয়া তিনি মলমূত্র ত্যাগের সময় রসনাবন্ধন করিয়া রাখিতেন। একদা শ্রীগোপাল প্রভুকে তদবস্থ দেখিয়া

কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন "প্রভো! মলমূত্রত্যাগের সময় দেহের অশুচি অবস্থা বলিয়া যদি সে সময় পবিত্র হরিনাম করা কর্ত্তব্য না হয়, তাহা হইলে এই ক্ষণভঙ্গুর দেহ হইতে যদি ঐ সময় প্রাণবায়ু বাহির হইয়া যায়, তবে আর অন্তিম কালে তো হরিনাম জপ করা হইল না"। শ্রীগোস্বামী প্রভু শুনিয়া অতি আনন্দিত হইলেন এবং কহিলেন "সাধু গোপাল, তুমি ধন্য" তোমার এই উপদেশটী অতি সদুপদেশ।" তিনি সেই দিন হইতে গোপালকে গুরু বলিয়া ডাকিতেন এবং এই কারণেই তাঁহার গোপাল গুরু নাম হইয়াছিল।

কলিযুগের তারকব্রহ্ম নাম যে ষোলনাম—বত্রিশ অক্ষর হরিনাম, এই শ্রীগোপাল গুরুই তাহার ব্যাখা করিয়া গিয়াছেন।

নাম।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

শ্রীমদ্ গোপাল গুরু গোস্বামিকৃত ব্যাখ্যা—

বিজ্ঞাপ্য ভগবত্তত্ত্বং চিদ্‌ঘনানন্দবিগ্রহং।
হরত্যবিদ্যাং তৎকার্য্য-মতো হরিরিতি স্মৃতঃ।
হরতি শ্রীকৃষ্ণমনঃ কৃষ্ণাহ্লাদস্বরূপিণী।
অতো হরেত্যনেনৈব শ্রীরাধা পরিকীর্ত্তিতা॥
আনন্দৈকসুখস্বামী শ্যামঃ কমললোচনঃ।
গোকুলানন্দনো নন্দনন্দনঃ কৃষ্ণ ঈর্য্যতে॥
বৈদগ্ধ্যসারসর্ব্বস্ব-মূর্ত্তিং লীলাধিদেবতাং।
রাধিকাং রময়েন্নিত্যং রাম ইত্যভিধীয়তে॥

অস্যার্থঃ—চিদ্‌ঘনানন্দ বিগ্রহ ভগবত্তত্ত্বকে বিশেষরূপে

জানাইয়া অবিদ্যা ও অবিদ্যার কার্য্যসমূহকে হরণ করেন বলিয়া "হরি" এইরূপে কথিত হন।

শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের আহ্লাদস্বরূপিণী। তিনি শ্রীকৃষ্ণের মন হরণ করেন। এই হেতু "হরা" শব্দে শ্রীরাধা পরিকীর্ত্তিতা হন।

কেবলানন্দ-সুখের স্বামী, শ্যামবর্ণ, কমললোচন, গোকুলানন্দ, নন্দ-নন্দনই 'কৃষ্ণ'' শব্দে কথিত হন।

শ্রীরাধার মূর্ত্তি বৈদগ্ধীর অর্থাৎ রসিকতার সারসর্ব্বস্বস্বরূপা। তিনি লীলার অধিদেবতা অর্থাৎ অধীশ্বরী। যিনি নিত্য সেই শ্রীরাধার সহিত রমণ করেন, তিনিই "রাম" শব্দে অভিহিত হন।

এই ব্যাখ্যা সম্বন্ধে অনুরাগবল্লী-প্রণেতা লিখিয়াছেন, যথা—

হরিনাম মধ্যে তিন নামের কথন।
হরে কৃষ্ণ রাম ব্যাখ্যা শুন দিয়া মন ॥
হরি শব্দে সম্বোধনেহ হয় হরে।
হরা শব্দে সম্বোধনেহ হয় হরে ॥
তাথে হরে শব্দের ব্যাখ্যা দুই শ্লোকে কয় ॥
কৃষ্ণ রাম নাম অর্থ দুই শ্লোকে হয় ॥
এই চারি শ্লোকে করি হরিনাম ব্যাখ্যা।
মহাপ্রভুর পরিবার প্রতি দিল শিক্ষা ॥

শ্রীমদ্ গোপাল গুরুর পূর্ব্বজন্ম সম্বন্ধে বৈষ্ণবাচার্য্যগণ যাহা নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাও বলা আবশ্যক; কারণ তাহাতে বুঝিতে পারা যাইবে, তিনি কত বড় সাধক ও কি বস্তু।

ইহাই নির্ণীত হইয়াছে যে, শ্রীগোপাল গুরু গোস্বামী শ্রীবৃন্দা-

বনলীলায় সুমুখীনাম্নী গোপিকা ছিলেন। যথা বৈষ্ণবাচার-দর্পণে—

কৃষ্ণব্যূহ অনিরুদ্ধ আছিল পূর্ব্বকালে।
বক্রেশ্বর পণ্ডিত গোসাঁই জানিহ একালে॥
এইরূপে গোপাল গুরু তাঁর ব্যূহ হন।
সুমুখী গোপিকা ভাবে হন নিমগন॥

ঐ যে ব্রজের সুমুখী গোপী, তিনি শ্রীরাধিকার প্রধানা অষ্ট সখীর মধ্যে শ্রীললিতা দেবীর যূথ মধ্যে পরিগণিতা ছিলেন। যথা শ্রীললিতা দেবীর যূথ সম্বন্ধে, শ্রীবৈষ্ণবাচারদর্পণে—

রত্নপ্রভা রতিকলা সুভদ্রা চন্দ্ররেখিকা।
সুমুখী চ ধনিষ্ঠা চ কলহংসী কলাপিনী॥

শ্রীগোপাল গুরু গোস্বামীর তিরোধানের পর নীলাচলের পাটবাড়ীতে তাঁহার প্রিয় শিষ্য শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামী প্রভু মোহান্তাসনে আসীন হন। ইনি একজন শক্তিধর ভক্ত বৈষ্ণব মোহান্ত ছিলেন এবং বহুশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত ছিলেন। বৈষ্ণবধর্ম্ম-সংক্রান্ত অনেক নিগূঢ় গুহ্য তত্ত্ব প্রভু শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামী বৈষ্ণবজগতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এবং তদ্দ্বারা ব্রজলীলার অনেক রহস্য উদ্ঘাটিত করিয়া সাধকগণের পরম হিতসাধন করিয়াছেন।

প্রভু শ্রীপাদ ধ্যানচন্দ্র গোস্বামীর শিষ্য-প্রশিষ্য-ক্রমে অদ্যাবধি ঐ নীলাচলের আশ্রমের গাদি অধিকৃত হইয়া আসিতেছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত ঐ আশ্রমের মোহান্তাসনে উপবিষ্ট হইয়া যাঁহারা মঠস্বামী হইয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের নাম ও পর্য্যায় দেওয়া যাইতেছে।—

(১) শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু।
(২) শ্রীশ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত গোস্বামী।
(৩) শ্রীশ্রীগোপাল গুরু গোস্বামী।
(৪) শ্রীশ্রীধ্যানচন্দ্র মোহান্ত গোস্বামী।
(৫) শ্রীবলভদ্র মোহান্ত গোস্বামী।
(৬) শ্রীদয়ানিধি মোহান্ত গোস্বামী।
(৭) শ্রীদামোদর মোহান্ত গোস্বামী।
(৮) শ্রীগোবিন্দানন্দ মোহান্ত গোস্বামী।
(৯) শ্রীরামকৃষ্ণ মোহান্ত গোস্বামী।
(১০) শ্রীহরেকৃষ্ণ মোহান্ত গোস্বামী।
(১১) শ্রীরাধাকৃষ্ণ মোহান্ত গোস্বামী।
(১২) শ্রীকৃষ্ণচরণ মোহান্ত গোস্বামী।
(১৩) শ্রীরাধামাধব মোহান্ত গোস্বামী।
(১৪) শ্রীহরেকৃষ্ণ মোহান্ত গোস্বামী।
(১৫) শ্রীগোবিন্দ চরণ মোহান্ত গোস্বামী।
(১৬) শ্রীবলভদ্রদেব মোহান্ত গোস্বামী।

এই (১৬) পর্য্যায়ের শেষোক্ত মোহান্ত গোস্বামী এক্ষণ পর্য্যন্ত মোহান্তাসনে আসীন আছেন।

এই মঠের মোহান্তগণ সদা সর্ব্বদা ঐ মঠেই অবস্থিতি করিয়া থাকেন। স্থানান্তরে ভ্রমণ এক প্রকার তাঁহাদের রীতি নাই। কিন্তু দীক্ষার্থী ব্যক্তিগণকে ঐ মঠেই দীক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন। অনেক উদাসীন বৈষ্ণব ঐ মঠে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সেই স্থানেই বাস করেন। এবং গৃহী ভক্তও দীক্ষা-মানসে সেখানে উপস্থিত হইলে মোহান্তগণ তাহাদের দীক্ষা দান দ্বারা

শিষ্য করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা কখনও মন্ত্র দীক্ষা দিবার জন্য কোন গৃহীর আলয়ে গমন করেন না। ঐ মঠে দেবসেবা ও অতিথিসেবা অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। শুনিতে পাওয়া যায়, শ্রীশ্রীরাধাকান্তের সেবা নির্ব্বাহ জন্য কিছু বিত্ত আছে এবং যাত্রীদের প্রদত্ত এবং শিষ্যদিগের প্রদত্ত প্রণামী ও দর্শনি দ্বারাও কিছু অর্থ সংগ্রহ হইয়া থাকে। নীলাচলে যে সকল যাত্রিগণ শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবকে দর্শন করিতে গমন করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এই মহাপ্রভুর শ্রীপাট দর্শন না করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন না। তাহা ত না করিবারই কথা, কারণ যে আলয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভু সুদীর্ঘ অষ্টাদশ বর্ষকাল বাস করিয়াছিলেন, তাহা গৌরভক্তগণের অবশ্য প্রধান তীর্থ স্থান, তাহাতে আর সন্দেহ কি। ঐ আশ্রমের যে গম্ভীরায় মহাপ্রভু বাস করিয়াছিলেন এবং যাহাতে তাঁহার অপ্রকটের পর তাঁহার কান্থা, করঙ্গ ও খড়ম দেবমূর্ত্তিতে পূজিত হইয়া আসিতেছেন, তথায় প্রভুর নিদর্শন স্বরূপ ঐ দ্রব্যগুলি দেখিতে কোন্ গৌরভক্তের অভিলাষ না হইবে? যে কান্থায় তিনি শয়ন করিয়াছিলেন ও যে করঙ্গ আর খড়ম তাঁহার নিত্য ব্যবহারের দ্রব্য ছিল, সেগুলি যে কি পবিত্র বস্তু, তাহা আর বলিবার প্রয়োজন করে না। শুনিতে পাওয়া যায় যে, অনেকেই ঐ পবিত্র নিদর্শন স্বরূপ কান্থার এক একটু টুকরা ঐ গম্ভীরারক্ষক বৈষ্ণবকে কিছু কিছু অর্থ দিয়া সংগ্রহ করিয়া থাকেন। অবশ্য ঐ অপূর্ব্ব নিদর্শন রাখিতে অনেকেরই বলবতী ইচ্ছা হইতে পারে, কিন্তু ঐরূপ টুকরা ক্রমে ক্রমে অপচয় হইতে দিলে এক সময়ে সমস্ত নিদর্শনটী নিঃশেষিত হইয়া যাইবার সম্ভব। এইজন্য ঐরূপ টুকরা আর কাহাকেও

না দেওয়া হয়, সে বিষয়ে মঠস্বামী মোহান্ত মহাশয়ের বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত।

নবম অধ্যায়।

নিমানন্দ সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবদিগের উপাসনা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিবার পূর্ব্বে সাধারণতঃ বৈষ্ণবোপাসনা-সংক্রান্ত দুই একটী কথার অবতারণা করা গেল।

হিন্দু ধর্ম্মের শাক্ত, সৌর, শৈব, বৈষ্ণব ও গাণপত্য এই পাঁচটী সম্প্রদায়ের মধ্যে বর্ত্তমান কালে এই বঙ্গদেশে—যে দেশের মৃত্তিকা শ্রীগৌরহরি পাদবিক্ষেপ দ্বারা পবিত্র করিয়াছেন—শাক্ত ও বৈষ্ণব এই দুইটী সম্প্রদায়ই বিশেষ প্রবল দেখিতে পাওয়া যায়। পরব্রহ্ম নিরাকার; তবে সাধারণ জীবগণে এরূপ নিরাকার পরব্রহ্মের সম্যকৃরূপে উপাসনা কি প্রকারে করিতে সক্ষম হইবে? এই জন্যই শাক্ত ভক্তগণ সাধনার জন্য ঐ নিরাকার পরব্রহ্মের একটী চিন্ময় রূপের কল্পনা করিয়া থাকেন। "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা"। এবং ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত উপাসকবৃন্দ আদ্যাশক্তিরূপা পরব্রহ্মের সাধনা করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠাধিকারী সাধকগণ ঐ কল্পিত চিন্ময়রূপে মা আদ্যাশক্তির দর্শনও পাইয়াছেন।

ভগবান্ ভাবগ্রাহী। তিনি ভাষার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া মনের ভাব প্রতি লক্ষ্য করিয়াই ভক্তকে কৃপা করিয়া থাকেন, তাঁহাকে ডাকিবার কোন নির্দ্দিষ্ট সুসংস্কৃত ভাষা নাই। এই জন্যই উক্ত হইয়াছে—

মূর্খো বদতি বিষ্ণায় ধীরো বদতি বিষ্ণবে।
উভয়োস্তু সমং পুণ্যং ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ॥

আবার ভগবান্ স্বয়ং ভাবময়। ভক্ত যে ভাবে তাঁহাকে ডাকে, ভাবসূত্রে আকৃষ্ট হইয়া তিনি সেই ভাবেই তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। গীতায় ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন যে "যাহারা যে ভাবেই আমাকে উপাসনা করে, আমি তাহাদিগকে সেই ভাবেই অনুগ্রহ করিয়া থাকি।" শ্রীকবিরাজ গোস্বামীও শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে বলিয়াছেন, যথা—

আমারে তো যে যে ভক্ত ভজে যে যে ভাবে।
তারে সে সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে॥

শাক্ত উপাসকগণ কল্পিত চিন্ময়রূপে ভগবান্‌কে ভজনা করায় ভগবান্‌ও ঐ চিন্ময়রূপে ভক্তগণকে দর্শন দিয়া থাকেন। কিন্তু ঐ ভজনা সম্পূর্ণরূপে ঐশ্বর্য্যময়ী। ঐশ্বর্য্যভাবে ভজনায় ভগবান্ ও ভক্তের মধ্যে কিছু ব্যবধান থাকে; মাধুর্য্যভাবে ভজনায় ভগবানের সঙ্গে ভক্তের যেরূপ মাখামাখি হয়, সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। এইজন্য মাধুর্য্য ভাবে ভজনা ভগবানের সমধিক প্রীতিকর। ঐ দুই প্রকার ভজনপ্রণালী সম্বন্ধে শ্রীভগবানের উক্তিস্বরূপে শ্রীকবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে যেরূপ লিখিয়াছেন, তাহাই উদ্ধৃত করা যাইতেছে।—

ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে সর্ব্ব জগত মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্য শিথিল প্রেমে মোর নাহি প্রীত॥
আমাকে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন।
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন॥

মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণপতি।
এই ভাবে করে যেই মোরে শুদ্ধ রতি॥
আপনাকে বড় মানে আমাকে সম হীন।
সর্ব্বভাবে হই আমি তাহার অধীন॥

এই যে মাধুর্য্যভাবে ভজনার কথা উক্ত শ্রীগ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই বৈষ্ণব-উপাসনা। অর্থাৎ ভগবানের সঙ্গে ঐরূপ কোন না কোন প্রকারের সম্পর্ক পাতাইয়া ভজনাই বৈষ্ণব-উপাসনা। ঐরূপ সম্পর্ক পাতাইয়া ভজনা করার পক্ষে বৈষ্ণবদিগের সুবিধা এই যে, তাঁহারা অবতারবাদ মানেন। যখন তাঁহারা, পরব্রহ্ম দেহধারী হইয়া তাঁহাদের মধ্যে অবতীর্ণ হন, এরূপ বিশ্বাস করেন, তখন ঐ দেহধারী ভগবান্‌কে নিজ জন বলিয়া জ্ঞান করিতেও তাঁহারা সক্ষম হন। বৈষ্ণব-ধর্ম্মানুমোদিত রস-প্রকরণে ঐরূপ সম্পর্ক চারি প্রকারে পাতাইবার বিধি আছে; যথা—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, ও মাধুর্য্য। শ্রীভগবানের, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাবতারের পূর্ব্বে তিনি সাধারণ জীবগণকে ঐরূপ রস আর কোন অবতারেই প্রদান করেন নাই। ঐ চতুর্বিধ ভক্তিরস কলিযুগের জীবগণকে শিক্ষা দেওয়াই শ্রীচৈতন্যাবতারের একটী প্রধান উদ্দেশ্য। তিনি জীবের প্রতি করুণা করিয়া ঐ বিশ্বব্যাপী চতুর্বিধ ভক্তিরস প্রদান করিতেই নবদ্বীপ ধামে শচীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম বিশ্বম্ভর। জ্যোতিষ-শাস্ত্র-বিশারদ পণ্ডিত শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তী পূর্ব্বে তাহাই বুঝিতে পারিয়া তাঁহার নামকরণ-কালে ঐ নাম রাখিয়াছিলেন। যথা—শ্রীমনোহর দাস-বিরচিত অনু-

পূর্ব্ব উপাসনা ছিল ঐশ্বর্য্য প্রধান।
এ মাধুরী চিরকাল নাহি করে দান॥
তবে কৃষ্ণ অনাদি নিমাই নাম ধরি।
চতুর্বিধ ভক্তিরস দিয়া বিশ্ব ভরি॥
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী জানিয়া অন্তর।
নামকরণের কালে কহে বিশ্বম্ভর॥

বিশেষতঃ ঐ চতুর্ব্বিধ রসের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যে শৃঙ্গার রস স্বরূপ স্বকীয় ভক্তি সম্পত্তি, তাহা সমর্পণ করিবার জন্যই কলিযুগে তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। যথা শ্রীমদ্রূপ গোস্বামি-কৃত বিদগ্ধমাধব গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ শ্লোক—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ,
সমর্পয়িতু-মুন্নতোজ্জলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ং।
হরিঃ পুরট-সুন্দর-দ্যুতি-কদম্ব-সন্দীপিতঃ,
সদা হৃদয়-কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥

অস্যার্থঃ—যিনি কলিযুগে অন্য অবতার কর্ত্তৃক অনর্পিত মুখ্য উজ্জ্বল রস-সম্পূর্ণ স্বীয় ভজন-সম্পত্তিরূপ ভক্তি প্রদানার্থ কৃপাবশে অবতীর্ণ হইয়াছেন, যাঁহার কান্তি সুবর্ণাপেক্ষাও সমুদ্ভাসিত, সেই শচীতনয় দেব হরি তোমাদিগের হৃদয়রূপ গিরিকন্দরে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হউন।

বিশেষ উজ্জ্বল রস অনন্যপ্রকাশ।
তাহা সমর্পিতে কলি-প্রথমে বিলাস॥
শুদ্ধ স্বর্ণ জিনি কান্তি অঙ্গীকার করি।
নবদ্বীপ মাঝে অবতীর্ণ গৌরহরি॥

সে হরি স্ফুরুন সভার হৃদয়-কন্দরে।
কলি-গজ-মদ-নাশ যাহার হুঙ্কারে॥

অনুরাগবল্লী।

এই শ্লোক দ্বারা বলিতেছেন যে, পশুরাজ যেরূপ গিরি-গুহায় সমুদিত হইয়া তত্রত্য করিযূথকে সংহার করে, সেইরূপ শচীতনয়রূপ সিংহও তোমাদিগের হৃদ্রূপ গিরি-গহ্বরে সমুদিত হইয়া তত্রত্য কামাদি রিপুকুলরূপ গজযূথকে বিনষ্ট করুন।

শাক্ত উপাসকগণ আদ্যাশক্তিরূপি পরব্রহ্মকে যে মাতৃ-সম্বোধনে ভজনা করেন, তাহা বৈষ্ণবগণের পূর্ব্বোক্তরূপ সম্পর্ক পাতাইয়া ভজনার মত সম্বোধন নহে। শাক্ত উপাসকের যে "মা," তিনি ঐশ্বর্য্যময়ী, সমস্ত-জগজ্জননী; আর বৈষ্ণব উপাসকের উপাস্য প্রভু তাঁহার নিজের প্রভু, বা সখা, বা পুত্র, বা পতি। তবে শ্রীচৈতন্যদেব যে রসাত্মক ভজন-প্রণালী প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার পরবর্ত্তী কালে কোন কোন শাক্ত সাম্প্রদায়িক সাধকও বৈষ্ণবদিগের উপাসনার আদর্শানুকরণে ভাবাবিষ্টচিত্তে আদ্যাশক্তির প্রতি ঐরূপ "মা" সম্পর্ক পাতাইয়া ভজনা করিয়াছেন। ভক্তপ্রবর রামপ্রসাদ সেন ঐরূপেই মাতৃ-সম্বোধন করিতেন। ঠিক পুত্রের নিজ জননীর নিকট যেরূপ আব্দার, তাঁহারও রচিত গীতগুলির মধ্যে এক একটী পদে ঐরূপ মাখামাখি পুত্রবৎ আব্দার দেখিতে পাওয়া যায় ও তদ্দ্বারা তিনি যে কত বড় ভক্ত ছিলেন, তাহার পরিচয়ও প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু হইতে যে বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের উৎপত্তির কথা পূর্ব্বে বলা গিয়াছে, সেই নিমানন্দ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীবক্রে-

শ্বর পণ্ডিত। প্রভুর সকল রূপ অপেক্ষা সর্ব্বপূর্ব্ব যে শ্রীনিমাই-রূপ, তিনি সেইরূপেই মুগ্ধ ছিলেন ও সেইরূপেই ঐ সম্প্রদায়ের উপাসনা নির্দ্দিষ্ট হয়। নিমাই তাঁহার আনন্দ, এই জন্য তাঁহার প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ের নাম নিমানন্দ। শ্রীবক্রেশ্বর-প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ের উপাসনা-পদ্ধতিমতে শ্রীনিমাইই শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীই ব্রজেশ্বরী শ্রীরাধিকা। এই সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবগণ যুগলরূপের উপাসক। শ্রীরাধাকৃষ্ণ তাঁহাদের উপাস্য দেবতা এবং ঐ উপাসনা শ্রীনিমাই-বিষ্ণুপ্রিয়া লইয়াও হইতে পারে।

এই দীনাতিদীন অধমের ইষ্টদেব শ্রীপাদ যদুনাথ পাঠক গোস্বামী, ঐ নিমানন্দ সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব গোস্বামী ছিলেন এবং শ্রীমৎ বক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রভুর পঞ্চ শাখার মধ্যে শ্রীমদ্ গোপালগুরু গোস্বামীর পরিবারভুক্ত ছিলেন।

এই ভক্তিহীন পামরের গুরুপ্রণালীটীও লিপিবদ্ধ হইল।—

(১) শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু,
তস্য সেবক ও পার্ষদপ্রবর—

(২) শ্রীশ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত গোস্বামী,
তস্য সেবক—

(৩) শ্রীশ্রীগোপালগুরু গোস্বামী,
তস্য অনুগত শিষ্য—

(৪) শ্রীগোবিন্দরাম পাঠক গোস্বামী,
তস্য অনুগত শিষ্য—

(৫) শ্রীকৃষ্ণরাম পাঠক গোস্বামী,

তস্য অনুগত শিষ্য—

(৬) শ্রীবলরাম পাঠক গোস্বামী,

তস্য অনুগত শিষ্য—

(৭) শ্রীবিনোদমোহন পাঠক গোস্বামী,

তস্য অনুগত শিষ্য—

(৮) শ্রীযদুনাথ পাঠক গোস্বামী।

এই যে পাঠক গোস্বামিগণের উল্লেখ করা হইল, তাঁহাদের বাসস্থান জেলা মেদিনীপুরের অন্তর্গত শ্রীপাঠ বলিহারপুর। ঐ শ্রীপাঠে অতি মনোহর শ্রীশ্রীগোবিন্দ দেব জীউর সেবা বিরাজমান। পাঠক-গোস্বামিবংশের সকলেই অতি দীর্ঘজীবী ছিলেন। সম্প্রতি এই সেবকাধমের ইষ্টদেবের পরলোকপ্রাপ্তির পর ঐ বংশের আর কেহই পুরুষ জীবিত নাই। শ্রীশ্রীগোবিন্দ জীউর সেবার ভার শ্রীপাদ মদীয় ইষ্টদেবের একটী বালিকা বিধবা ভ্রাতুষ্পুত্রীর উপরই ন্যস্ত হইয়াছে। এই জন্য প্রধান প্রধান শিষ্যমণ্ডলীর পরামর্শমতে জনৈক সদ্বংশজাত জ্ঞানবান্ নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণযুবককে শ্রীশ্রীবিগ্রহের সেবাধিকারী করা হইয়াছে। তিনি নীলাচলের মঠের আশ্রমধারী মোহান্তের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব হইয়া অতি নিষ্ঠার সহিত সেবা কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। শিষ্যমণ্ডলীর আর তাঁহাকে গোস্বামী বলিয়া স্বীকার করিতে এবং তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে কোন আপত্তি হইতে পারে না।

এই অভিলাষ মনে— গৌরাঙ্গচাঁদের গুণে
মাতিয়া বেড়াই দিবানিশি।
লক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়াসঙ্গ নদীয়া-বিহাররঙ্গ,
সে সুখসায়রে যেন ভাসি॥
(ভক্তিরত্নাকর)

দশম অধ্যায়

এই অধ্যায়ে প্রভু বক্রেশ্বর পণ্ডিতের একটী অষ্টশ্লোকী স্তব দেওয়া হইল। অষ্টকটী শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে অদ্বিতীয় সুপণ্ডিত শ্রীনীলমণি গোস্বামী প্রভুর বিরচিত। এই অষ্টকটী সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা প্রয়োজন বোধ করিতেছি।

জেলা মেদিনীপুরের মধ্যে কোন পল্লীগ্রাম-নিবাসী জনৈক পরিচিত ব্যক্তির নিকট হইতে শ্রীমদ্বক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রভুর অষ্ট-শ্লোকী স্তোত্র-সম্বলিত একখানি লিপি প্রাপ্ত হই। সেই লিপি-খানি দেখিয়াই বোধ হইল যে, উহা শব্দ-পতন ও বর্ণাশুদ্ধি প্রভৃতি দোষে অনেকস্থলে অশুদ্ধিপূর্ণ। মনে হইল যে, কোন কাব্যশাস্ত্র-বিশারদ ভাগবত গোস্বামী পণ্ডিতের দ্বারা অষ্টকটীর অশুদ্ধি শোধন করাইয়া লইয়া পাঠোপযোগী করিয়া রাখা উচিত। সে সময় সরকারি কার্য্যে বিদেশে থাকা নিবন্ধন অনেক দিন পর্য্যন্ত আর তাহার কোন সুযোগ হইয়া উঠিল না। অবশেষে মনে পড়িয়া গেল যে, আমার একজন হিতৈষী সুহৃদ্ শ্রীপণ্ডিত প্রভু নীলমণি গোস্বামীর মন্ত্র-শিষ্য। আমার ঐ বন্ধুবর তৎ-কালে নিত্যধাম শ্রীবৃন্দাবনে সপরিবারে বাস করিতেছিলেন

এবং নিয়ত ধর্ম্মচর্চ্চা ও ভক্তিচর্চ্চায় সার আনন্দ অনুভব করিতেছিলেন। তাঁহার গুরুদেবও শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতেন। উক্ত প্রভুপাদের কৃপাভিক্ষা-মানসে আমার ঐ বন্ধুবরকে একখানি পত্র লিখিলাম এবং তৎসহিত ঐ অশুদ্ধ অষ্টকটীরও একখণ্ড অবিকল নকল পাঠাইয়া দিলাম। ঐ পত্রের উত্তরে উক্ত মহাত্মা গোস্বামী প্রভুর আমার প্রতি দয়ার কথা অবগত হইলাম। বন্ধুবর যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে লেখা ছিল—যথা—

"মহাশয়ের (এই দীনাতিদীনের) প্রেরিত অষ্টকটী শ্রীযুত প্রভুপাদকে দেখান হইয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রভুপাদ অষ্টকটী আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া বলিলেন যে, ইহাতে সংস্কৃত ভাষা দোষপূর্ণ, আর যে তূণকছন্দঃ অবলম্বন করিয়া অষ্টক রচিত হইয়াছে, ঐ ছন্দও ঠিক হয় নাই। বিশেষতঃ ঐ তূণকছন্দে "বক্রেশ্বর" এই নাম বিন্যাস করা যাইতে পারে না। আপনার যদি অভিপ্রেত হয়, তবে শ্রীযুক্ত প্রভুপাদ শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতের একটী স্তব অন্য কোন ছন্দে রচনা করিয়া দিতে পারেন।"

এই পত্র পাইয়া আমার মনে যে ভাবের উদয় হইল, তাহা বর্ণনাতীত। প্রভুপাদের এই দীনাতিদীন সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তির প্রতি এরূপ অসীম দয়া প্রকাশ জন্য মনে মনে শ্রদ্ধাসমন্বিত শত সহস্রবার উদ্দেশে তাঁহার শ্রীচরণে প্রণাম করিলাম। বলা বাহুল্য যে, প্রভুপাদের রচিত একটী অষ্টক প্রাপ্তির আশায় বন্ধুবরকে পত্র লিখিলাম। কিছুদিন পরেই বন্ধুবরের একখানি পত্র ও তাহার মধ্যে গোস্বামী প্রভুর রচিত ঐ অষ্টকটী প্রাপ্ত হইলাম। বন্ধুবর ঐ পত্রে লিখিয়াছিলেন, যথা—"এক্ষণে অবসর পাইয়া শ্রীপাদ আপনার (এই সেবকাধমের) জন্য শ্রীশ্রী৺ বক্রেশ্বর

পণ্ডিতের একটী অষ্টক ইন্দুবংশা ছন্দে রচনা করিয়াছেন। ইন্দুবংশা ছন্দ অতীব মধুর।"

ঐ অষ্টকটী আমার নিত্যপাঠ্য এবং তাহাই এই অধ্যায়ে লিখিলাম।

অষ্টক।

(১)

বিপ্রান্বয়ে পূর্ব্বতনীং পবিত্রতা-
মাবির্ভবন্নাবি-রভাবয়দ্ ভুবি।
যো বাল্যতঃ পাল্যজনানুকম্পক-
স্তং নৌমি বক্রেশ্বর-মীশ্বরং মম॥

(২)

অশেষ-শাস্ত্রার্থ-রহস্য-কোবিদো,
বিদ্যার্থিভির্বন্দিত-পাদ-পঙ্কজঃ।
বিদ্যাং দদৌ যঃ সদয়ং দয়ার্দ্রধী
স্তং নৌমি বক্রেশ্বর-মীশ্বরং মম॥

(৩)

উদ্দণ্ড-পাষণ্ড-পথাবখণ্ডিনীং
যস্যৈব পণ্ডাং পরিচিত্য পণ্ডিতৈঃ।
প্রীত্যার্পিতা সার্থক-পণ্ডিতাভিধা,
তং নৌমি বক্রেশ্বর-মীশ্বরং মম॥

(৪)

হিত্বা চতুর্ব্বর্গসুখাভিলাষিতা-
মৈকান্তিকীং ভক্তি-মভীক্ষ্ণমাচরন্।
যোঽজীগ্রহজ্জাল্মমতীন্ জগজ্জনান,
তং নৌমি বক্রেশ্বর-মীশ্বরং মম ॥

(৫)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মভীষ্ট-মাত্মনঃ
সন্তোষয়ন্ সন্তত-মেকভাবতঃ।
যোঽহস্ত্রয়ং জাতু ননর্ত্ত চিত্রধা,
তং নৌমি বক্রেশ্বর-মীশ্বরং মম ॥

(৬)

গায়ন্তি গন্ধর্ব্বগণাঃ সহস্রশো
নৃত্যামি চেত্তত্র তদৈব মে সুখং।
দেহীতি যঃ প্রাহ মুহুর্মহাপ্রভুং
তং নৌমি বক্রেশ্বর-মীশ্বরং মম ॥

(৭)

যেনোৎকলে লোকহিতোৎকচেতসা
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমতং ব্যতন্যত।
নীতা নরাস্তদ্দশভাং পরঃশতা-
স্তং নৌমি বক্রেশ্বর-মীশ্বরং মম ॥

(৮)

যৎপাদমাশ্রিত্য নরাঃ সহস্রশঃ
শুদ্ধাং হরের্ভক্তি মবাপুরঞ্জসা।
ভক্তিপ্রদং ভক্তবরং মহাপ্রভো-
স্তং নৌমি বক্রেশ্বর-মীশ্বরং মম ॥

ফলশ্রুতি।

যঃ স্তৌতি বক্রেশ্বরপণ্ডিতাভিধং
বিশ্বস্য বিশ্বম্ভর-পার্ষদর্ষভং।
নুত্যানয়া নীলমণি-প্রণীতয়া,
বিশ্বম্ভরে ভক্তিভরং লভেত সঃ।

অর্থ।

বক্রেশ্বরাষ্টক।

(১)

পবিত্র বিপ্রের কুলে উদয়ে যাঁহার,
প্রকাশিল পূর্ব্বপ্রভা অতুলনা তার।
বাল্য হ'তে অনুজনে দয়ার আধার,
নমি সেই বক্রেশ্বরে প্রাণেশ আমার

(২),

অশেষ শাস্ত্রের গূঢ়-মর্ম্ম-বিশারদ,
বিদ্যার্থি-বন্দিত যাঁর পদ-কোকনদ।
দয়া করি বিদ্যা দান করিলেন সার,
নমি সেই বক্রেশ্বরে প্রাণেশ আমার॥

(৩)

উদিত পাষণ্ড-পথ করি অপনীত,
শুনিয়া পণ্ডার কথা যতেক পণ্ডিত।
সার্থক পণ্ডিত নাম রাখিলেন যাঁর,
নমি সেই বক্রেশ্বরে প্রাণেশ আমার॥

(৪)

চতুর্ব্বর্গ সুখ-আশা বর্জ্জন করিয়া,
নিরন্তর ঐকান্তিকী ভক্তি আচরিয়া।
লইলেন ভক্তিপথে নীচাত্মা সবার,
নমি সেই বক্রেশ্বরে প্রাণেশ আমার॥

(৫)

আপন অভীষ্ট দেব শ্রীচৈতন্তে সদা,
একভাবে তোষি, যিনি ছিলেন একদা
নৃত্যে ভোর তিন দিন আশ্চর্য্য প্রকার,
নমি সেই বক্রেশ্বরে প্রাণেশ আমার॥

(৬)

সহস্র গন্ধর্ব্ব যদি সাথে গান করে,
নাচিয়া আনন্দ তবে এই আশা ক'রে,
যাচিলেন প্রভু ঠাঁই তাই বারংবার,
নমি সেই বক্রেশ্বরে প্রাণেশ আমার ॥

(৭)

লোকহিতে আকুলিত অন্তর যাঁহার,
প্রভুমত করিলেন উৎকলে প্রচার।
শত শত নরে আনিলেন বশে তাঁর ;
নমি সেই বক্রেশ্বরে প্রাণেশ আমার ॥

(৮)

যাঁহার চরণ লোকে করিয়া আশ্রয়,
পাইল বিশুদ্ধ ভক্তি, হরিপদাশ্রয়।
ভক্তিপ্রদ ভক্তবর সেই প্রেমাধার,
নমি প্রভু বক্রেশ্বরে প্রাণেশ আমার ॥

ফলশ্রুতি শ্লোকের অর্থ।

যিনি বিশ্বম্ভর দেবের পার্ষদশ্রেষ্ঠ শ্রীপণ্ডিত বক্রেশ্বরকে নীলমণি রচিত এই অষ্ট শ্লোকের স্তব দ্বারা শ্রদ্ধাসহকারে স্তব করিবেন, তাঁহার শ্রীবিশ্বম্ভরের প্রতি অতিশয় ভক্তি লাভ হইবে।

সম্পূর্ণ।